লাজুকলতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



রীডার্স কর্ণার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ—কোজাগরী পূর্ণিমা ১৩৬০

দাম আড়াই টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীসুমুখ মিত্র

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
বেঙ্গল অটোটাইপ

কলিকাতা ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন হইতে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র এম. এ.
প্রকাশ করেছেন আর ঐ ঠিকানায় বোধি প্রেসে ছেপেছেন

লেখকের কথা

এই সঙ্কলনের অধিকাংশ গল্প গত তিন চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি গল্প সঙ্কলনে মূল একটি সূত্রের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজ জীবনের কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছোট ছোট কাহিনীর মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে তাকে আশ্রয় করে গল্প চয়ন করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

এই সংকলনেও সেই চেষ্টাই করেছি। কতটা সফল হয়েছে আমার বিচার্য্য নয়।

—লেখক

কলিকাতা

কোজাগরী পূর্ণিমা ১৩৬০

লাজুকলতা

উপদলীয়

এদিক ওদিক

এপিঠ ওপিঠ

পাশ ফেল

কলহান্তরিত

গুণ্ডা

বাহিরে ঘরে

চিকিৎসা

মীমাংসা

সুবালা

অসহযোগী

আপদ

স্বাধীনতা

নিরুদ্দেশ

পাষণ্ড

লাজুকলতা

তমাললতার লজ্জার বহর দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়।

এ যুগে সহরবাসী শিক্ষিত একটা মানুষের বৌ যে এমন লাজুক হতে পারে এ যেন ধারণাই করা যায় না।

তমাল নিজেও নাকি কিছুকাল স্কুলে যাতায়াত করেছিল!

শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজন নেই, বছর পাঁচেকের একটি ছেলে আর তিন বছরের একটি মেয়ের মা, তবু সব সময় সে যেন লজ্জায় জড়ো সড়ো হয়ে থাকে, নিজেকে মানুষের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে পারলেই সে যেন বাঁচে।

বীরেনের দোতলা বাড়ীর একখানা ঘরে সম্প্রতি তারা সহরের অন্য এলাকা থেকে উঠে এসেছে। বাড়ীতে ঘর ভাড়া দেবার কোন প্রয়োজন বা ইচ্ছা বীরেনের ছিল না। যতীনের উপর এটা তার অনুগ্রহ দেখানোই বলা যায়।

বীরনের বড় ছেলে হেমাঙ্গের সঙ্গে যতীনের পরিচয়ের সুযোগে এই সুবিধাটুকু যতীন আদায় করেছে।

একটা ঘর ভাড়া নিয়েই সে বাস করছিল সহরের অন্য এলাকায় এবং ভাড়াটে নিয়মিত ভাড়া দিয়ে ঘর দখল করে থাকলে তাকে উঠিয়ে দেবার ক্ষমতাও বাড়ীওলার থাকে না—তবু কেন যে সে ওই ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে বিপন্ন হয়ে এবাড়ীতে আরেকটি ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে এল, হেমাঙ্গও ভাল বুঝতে পারে নি।

বিপন্ন বন্ধুর প্রতি এই দয়া প্রদর্শনে বাড়ীর লোকেরা মোটেই খুশী হয়নি হেমাঙ্গের উপর।

বন্ধুত্ব ছিল কেবল হেমাঙ্গ ও যতীনের মধ্যে, এ বাড়ীতে ভাড়া করে উঠে আসার আগে তমালকে কেউ দেখেনি। তাকে দেখে বরং তাদের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তমাললতার ভীরুতা ও লাজুকতার বাড়াবাড়িতে অনেকে তাজ্জব বনে গেলেও মুখের অন্ধকার অনেকটা কেটে গিয়েছে বাড়ীর লোকের।

বীরেনের বড় মেয়ে সুচারুকে তার স্বামী নেয় না। সে অবশ্য মুখ বাঁকিয়ে বলে, ঢং!

বলে, মাগীর সব ন্যাকামি আর বজ্জাতি। অত লজ্জা কেউ দেখায় না, উনি তাই বেশী করে লজ্জা দেখিয়ে দশজনের নজর টানেন। এ যেন বুঝতে দেরী লাগে কারো। আমার বুড়ো বাপকে দেখে তুই কোন্ লজ্জায় আধহাত ঘোমটা টানিস?

কিন্তু বাড়ীর এবং পাড়ার বুড়োবুড়ীরা পছন্দ করে তমালের প্রায় বেহায়াপনার মত লাজুকপনা। এরকম চালচলনই তো মানায় গেরস্ত ঘরের যোয়ান বয়েসী বৌয়ের। মুখে রা নেই, ফটাং ফটাং যখন তখন ঘর থেকে বেরিয়ে পাড়া চষে বেড়ানো নেই, পুরুষকে তফাতে রেখে আড়ালে রেখে চলায় এতটুকু ঢিল নেই।

হেমাঙ্গের সঙ্গে সে নাকি আগে কথা বলত।

হেমাঙ্গ তারই জের টেনে তার সঙ্গে দুচারবার কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু তমাল মুখ ফেরায় নি, মুখ খোলে নি।

ছেলেকে দিয়ে হেমাঙ্গের কথার জবাব দিয়েছে।

হেমাঙ্গের বুড়োবুড়ী মা-বাপ ফেলেছে স্বস্তির নিশ্বাস।

কিন্তু হেমাঙ্গের কলেজে পড়া ছোট বোন সুমায়া বলেছে, তোমরাও

যেমন! এরকম উদ্ভট খাপছাড়া রকম সকম দেখে কোথায় আরও ভড়কে যাবে, তোমরা খুসী হয়ে উঠলে!

বুড়ী সুভদ্রা বলে, তুই বুঝবি নে। তুই কেবল একপেশে বিচার শিখেছিস। খাপছাড়া বটেই তো, এরকম খাপছাড়া লজ্জা কোন বৌয়ের দেখা যায় আজকাল? কিন্তু একটা খাপছাড়া অবস্থায় পড়েছে বলেই নিশ্চয় এরকম খাপছাড়াভাবে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তুই তলিয়ে সব জেনেছিস ওদের ভেতরের ব্যাপার? না জেনেই চটাং চটাং কথা কইছিস। আমরা টের পেয়েছি তাই আমরা বলছি, বেশ করছে।

কি টের পেয়েছো?

সে তুই বুঝবি নে, অত কথায় তোর কাজ নেই। যতীনের অনেকদিন চাকরী নেই খবর রাখিস? দেখায় যেন চাকরি করে, কিন্তু আমরা টের পেয়ে গেছি। সাধে কি ঘর ছেড়ে বন্ধুর বাড়ী ঘর ভাড়া নিয়েছে? সেখানে ভাড়া বাকী পড়লে মালপত্র আটক রেখে খেদিয়ে দিত। বন্ধু তো আর তা পারবে না। মানুষটা মরিয়া হয়ে উঠেছে —বৌটা নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে না?

সুমায়া হঠাৎ যেন বিদ্যুতের ঝলকানি চেয়ে দেখেছে এমনিভাবে চোখ পিট পিট করতে করতে বলে, ও!

যতীন একটু ঝাঁঝালো হাসির সঙ্গেই বলে, ভবেশবাবুর মা ডেকে তোমার প্রশংসা শোনালেন। তোমার মত খাঁটি বৌ নাকি পাড়াতে আর নেই। তা, কথাটা সত্যি। ওনার নাতি-বৌয়ের সঙ্গে তুলনা করলে সত্যি তোমার তুলনা মেলা ভার!

কালো টানা চোখ তুলে ঝিলিক মেরে চেয়েই তমাল চোখ নামায়। পাতলা ঠোঁটের অপূর্ব্ব কারসাজিতে একটু রহস্যময় হাসিরও ঝিলিক খেলিয়ে দেয়।

যতীন সারাদিন চাকরী এবং রোজগারের সন্ধানে টো টো করে ঘুরেছে। দেহমন দুইই তার শ্রান্ত এবং ক্লান্ত। মুখটা যেন স্থায়ীভাবে বেঁকেই আছে।

হতাশায় মন বাঁকা হয়ে যাওয়ারই বোধ হয় এটা প্রকাশ্য লক্ষণ। কেবল চাকরী করার অধিকার নয়, সংসারের কোন অধিকার খাটাবার ক্ষমতাই যেন তার নেই।

বৌটা পর্য্যন্ত তার হুকুম মানে না।

মুখ আরেকটু বাঁকিয়ে সে বলে, সেদিন নীরেনবাবুও বলছিলেন, তুমি তো ভাগ্যবান পুরুষ যতীন! এই ভেজালের যুগে খাঁটি সহধর্মিনী পেয়েছো। চুলদাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে, নইলে একটা চাপড় কষিয়ে দেবার কথা ভাবতাম।

গামছা লুঙ্গি হাতে দিয়ে তমাল মৃদুস্বরে বলে, ভবেশবাবু নীরেন বাবুদের বল না একটা চাকরী জুটিয়ে দিক! পাড়ার একমাত্র খাঁটি বৌটির যে সিঁদুর কেনার পয়সা নেই?

যতীন সচকিত হয়ে তার মুখের ভাব দেখবার চেষ্টা করে। সত্যই কি এমন তীব্র তীক্ষ্ণ রসিকতা করেছে তমাল, অথবা আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছে কথাগুলি তার মুখ দিয়ে?

কিন্তু ইচ্ছা বা প্রয়োজন হলেই তমালের মুখ দেখা অত সহজ ব্যাপার নয় তার স্বামীর পক্ষেও। কথা বলতে বলতে তমাল নত হয়ে মাথা নামিয়ে তার জুতোজোড়ার ধুলো ঝাড়তে সুরু করেছিল। পুরোণো হয়ে গেছে ভাল দামী জুতো জোড়া—একটা প্রায় সুনিশ্চিত চাকরীর আশায় মরিয়া হয়ে কেনা হয়েছিল।

এবার ছিঁড়ে যাবে।

তবু এই জুতো পায়ে দিয়েই কাল আবার তাকে বার হতে হবে চাকরীর খোঁজে।

হেমাঙ্গ গিয়েছিল বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে। সে বাড়ী ফেরে রাত ন'টার পর।

যতীন খেয়ে উঠে চৌকীর বিছানায় বসে পান চিবোতে চিবোতে মেঝেতে ছেলেমেয়ের বিছানায় মশারি খাটিয়ে গুঁজে দেওয়ার কাজে রত তমালকে দেখছিল।

হেমাঙ্গকে ডেকে বলে, এত রাতে?

হেমাঙ্গ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাঁকা চোখে তমালের দিকে চেয়ে বলে, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

বোধ হয় সদ্য সদ্য সিনেমা থেকে বাড়ী ফিরেছে বলেই সস্তা পচা নোংরা ছবির আমেজটা মনে রয়ে গেছে। নইলে এভাবে পরের বৌয়ের দিকে তাকানো তার ধাত নয়।

ভাল বই?

একদম বাজে বই।

ঘরে এসো না? একটু শুনি ছবিটার কথা। আমিও একবার দেখব ভাবছিলাম। সাড়ে নট'র শো দেখা যায়, না?

তমাল তাড়াতাড়ি মেঝেতে ছেলেমেয়ের বিছানায় টাঙ্গানো মশারির ওপারে চলে যায়। আড়ালে জানালায় বসে বোধ হয় তাকিয়ে থাকে বাইরের বিদ্যুতের আলোয় সাজানো সহরতলীর গেঁয়ো আঁধারের দিকে।

হেমাঙ্গ হঠাৎ যেন চেতনা পায়। বলে, বড় খিদে পেয়েছে ভাই। পেটটা জ্বলে যাচ্ছে।

বলেই সে চলে যায় ঘর ছেড়ে।

যতীন গিয়ে চুলের মুটি চেপে ধরে তমালের।

হারামজাদি, ঘরে ভদ্রলোক এলে তার সঙ্গে একটু ভদ্রতাও করতে পারিস না?

তমাল শান্ত মৃদু কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলে, আমার কিন্তু দাঁত আছে। চুল টেনে যত ব্যথা দিচ্ছ, দাঁত দিয়ে কামড়ালে তার চেয়ে দশ গুণ বেশী ব্যথা পাবে।

যতীন তার চুল ছেড়ে দেয়। সে জানে তার লাজুক বৌ কামড়ে তার মাংস তুলে নিতে পারে।

মোটে দু'মাস আগের অভিজ্ঞতা এত তাড়াতাড়ি কি ভোলা যায়।

তমালকে দেখেই রাধাশ্যামের হয়েছিল কৃষ্ণভাব। পরদিন থেকে যতীনকে দেড়শো টাকার চাকরীর নিয়োগ পত্র সই করে তার হাতে তুলে দিয়েছিল।

কিন্তু সিঁড়ির তলার রান্নাঘর থেকে গায়ের জোরে তমালকে শোবার ঘরে রাধাশ্যামের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে তমালের ধারালো দাঁতে ঘাড়ের কাছে খানিকটা মাংস উঠে গিয়েছিল যতীনের।

ঘাটা সেরেছে।

তমালের দাঁতের ভয় কমে নি।

সুমায়া এবং ঘরের পাশের দু'তিনটি অল্পবয়সী মেয়ে-বৌয়ের যেন বিশেষ দরদ দেখা দিয়েছে তমালের জন্য। তারা সুমায়ার বন্ধু বলেই কিনা কে জানে!

সুমায়ার দরদটাই সবচেয়ে বেশী।

কলেজ থেকে ফিরে বই খাতা সে আগেও টেবিলে ছুঁড়ে দিত। এটা তার চিরকালের বই রাখার কায়দা। আজকাল গায়ের বিশেষ শাড়ী জামাগুলি পর্য্যন্ত প্রায় ওইভাবে খুলে ছড়িয়ে ফেলে ঘরোয়া বেশে তমালের নীচু ছোট রান্নাঘরের দরজায় বসে পড়ে।

কলেজে কাঠের ডেস্ক-টেবিলে বসে অধ্যাপকদের মুখস্ত করা

লেকচার শুনতে শুনতে তার যেন শুধু ডেস্ক-চেয়ারে বসা নয়—ডেস্ক-চেয়ারী সভ্যতা সম্পর্কে পর্য্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে !

সে যেন তাই মাটিতেই আলুথালু বেশে অসভ্যের মত বসে স্বস্তি পেতে চায়। তমালের এগিয়ে দেওয়া সাতরঙা উলের বোনা আসনটা সে তাই গুটিয়ে রাখে।

তমাল নিজে বুনেছিল আসনটা। সাতটা আদিম রঙ দিয়ে। তার জীবনেও যখন রঙ ছিল তখন।

তবে আজ মনে হয়, যতীনের ক্লিষ্ট ফ্যাকাশে মুখে যেন শুধু এই বীভৎস ঘোষণা যে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন রস নেই, রং নেই—অথচ তার অধীনস্থা নারীটি তারই ঘরের কোণে সাত রকম রঙ দিয়ে আসন বুনেছে অতিথি অভ্যাগত আত্মীয়-স্বজন ঘরে এলে বসতে দেবার জন্য !

এ যেন আকাশের মতই উদারতা ঘরের কোণার লাজুক বৌটির। জীবনের সব সুখ আর উত্তাপের সূর্য্যকে ঢেকে দিয়ে নামে জীবনের ঘন কালো দুঃখের বর্ষা, আবার এক ফাঁকে মেঘ সরিয়ে অস্তমান সূর্য্যের আলোয় আকাশে সাত রঙা রামধনু রচনা করে।

তাকে বসতে সাতরঙা আসন এগিয়ে দেয়, কড়াই নামিয়ে কেটলি চাপিয়ে জল ফুটিয়ে চা করে দেয় কিন্তু সুমায়ার জীবনের উপর বিতৃষ্ণা আর বিরাগ যেন তারই উপর ঘনীভূত হতে থাকে।

তমালের তৈরী করা চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকিয়ে সে বলে, তুমি অন্যায় করছ ভাই। তুমি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছ।

তমাল বলে, বাপের খাও পড়, কুমারী মেয়ে, তুমি বুঝবে না। আমি অন্যায় ঠেকাচ্ছি, লড়াই করছি।

এরকম সেকেলে বৌ-পনা দিয়ে ?

আর যে কোন উপায় নেই ভাই ? হয় এরকম সেকেলে বৌ-পনা, নয় তো মরার বাড়া বেহায়াপনা।

তুমি বোকা। তুমি ভুল করছ। সেকালেও আমরা এরকম বৌ ছিলাম না, একালেও আমরা বেহায়া হয়ে যাই নি। তুমি একজনকেই আঁকড়ে থাকবে। এটা নিয়ম নয়, রীতি নয়, নীতিও নয়।

তমাল শান্তভাবেই বলে, কিন্তু আইন যে—মোটা বাস্তব আইন। একবার ভাঙলেই আমায় একেবারে শেষ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। বাঁচার অন্য কোন রকম উপায় থাকলে কেউ সাধ করে এই মরণদশা আঁকড়ে থাকে?

গায়ে গায়ে লাগানো পাশের বাড়ীর একতলার একখানা ঘরের ভাড়াটে বিলাসের বৌ প্রমীলা যেন গঙ্গায় স্নান করতে অথবা সিনেমা দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে আনমনে পথ ভুলে তমালের রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

বলে, কি হচ্ছে?

সেও সাতরঙা উলের আসন ঠেলে দিয়ে মেঝেতে বসে। গায়ে তার রঙীন শাড়ী জড়ানো আছে।

তমাল বলে, উঠে আসাটা কি ভাল হল ভাই?

প্রমীলা হাসবার চেষ্টা করে বলে, এ জন্মে ওঠা হাঁটা আর হবে কিনা কে জানে? টাকা যোগাড় করে বারোটা একটায় ফিরবার কথা। বৌকে যে হাসপাতালে বাঁচতে পাঠাবে সে কি আর পাঁচটা নাগাদ আপিস করছে? তার মানেই টাকা যোগাড় হয় নি! ভাবলাম, আমি তো একটা একেলে বৌ? ঘরের কোণে মুখ গুঁজে মরি কেন? পাশের বাড়ীর সেকেলে বৌটার সঙ্গে দু'টো কথা কই মরার আগে।

প্রমীলার মুখ দেখেই বোঝা যায়, গায়ে তার তিন চার ডিগ্রি জ্বর। আজকালের মধ্যে কঠিন একটা অপারেশন না হলে তার মরণ সুনিশ্চিত। সেই ব্যবস্থার শেষ চেষ্টা, চরম চেষ্টা, করতে বেরিয়েছিল বিলাস। তার ফেরার কথা ছিল বারটা একটার মধ্যে।

সুতরাং বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে বোঝা গিয়েছে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে।

সুমায়া মাথা হেঁট করে থাকে।

প্রমীলা দরজায় ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে বসে চোখ বুজে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, ঘরে শুয়ে থাকতে যন্ত্রণা হচ্ছিল, মরে যাচ্ছিলাম যন্ত্রণায়। উঠে এসে তোমার ঘরে বসে যন্ত্রণা কমে গেছে ভাই।

তমাল বলে, গলার হারটা ক' ভরির? হাতের চুরিগুলি? মরার পর শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাবার আগেই ওগুলো কিন্তু জ্যান্ত মানুষেরা খুলে নেবে ভাই।

সুমায়া যেন চাবুক খেয়ে মাথা তোলে।

হেমাঙ্গ বাথরুমে বৈকালিক স্নানের জন্য জলের আশায় অপেক্ষা করছিল। জলের মালিকদের দয়া হলে জল দু'চার বালতি হয়তো এসেও যেতে পারে কলটার মুখ দিয়ে।

সুমায়া তাকে ডাকে। বলে, চট করে জামা কাপড়টা পরে এসো দিকি। এই হারটা বেচে টাকা নিয়ে এসো। একে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

লাজুক তমাল আজ কথা কয় হেমাঙ্গের সঙ্গে! মুখ তুলে চেয়ে বলে, হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থাই করুন না আগে? হারটা তো রইল।

প্রমীলার পাশের ঘরের ভাড়াটে নন্দা তাকে খুঁজতেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

নজর এড়িয়ে প্রমীলা কখন উঠে এসেছে সে টেরও পায় নি। বোধহয় ভালই হয়েছে টের না পেয়ে। টের পেলে হয় তো সখিত্বের জোরে তাকে ঘরে আটকে রাখত স্বামীর অপেক্ষায় মরবার জন্য।

নন্দা স্মার্ট মেয়ে, লাজলজ্জার ধার ধারে না। পাড়ার বদ ছোঁড়া আর প্রৌঢ় বয়সী লোকেরা যেসব মেয়ে বৌয়ের দিকে লালসা ভরা

চোখে তাকায় নন্দার বয়স তাদের চেয়ে বেশী হবে না। পাড়ার যে কোন বদ ছোঁড়াটাকে যে কোন সময়ে ঘরে বসিয়ে একা আলাপ করতে সে সর্ব্বদাই রাজী কিন্তু অন্য মেয়ে বৌয়ের হাত চেপে ধরার সুযোগ খুঁজে যে হয়রাণ হয় সেও সাহস করে নন্দার সঙ্গে কথা কইতে এগোয় না।

নন্দা নির্ভয়ে সমানভাবে ভদ্রভাবে আলাপ করবে। ইয়ার্কি দিতে গেলে হয় তো দ্বিধামাত্র না করে গালেই মেরে বসবে একটা চড়!

ভীরু মেয়ে না হলে বজ্জাতি করেও সুখ নেই

নন্দা বলে, তোমার না খুব লাজুক বলে বদনাম? তুমিই দেখছি একটা ব্যাটাছেলেকে হুকুম দিয়ে ছুঁড়িটাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। ওর স্বামীটা কি করে আমরা সবাই তার অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে আছি।

সুমায়া বলে, আমরা যে নিয়মে চলি,—ব্যাটাছেলের ছকে দেওয়া নিয়ম ছাড়া চলতে জানি না। লাজুক হবার দরকার হলেও আমরা যে লাজুক হতে লজ্জা পাই।

হেমাঙ্গ এম্বুলেন্স নিয়ে এলে তারা ধরাধরি করে প্রমীলাকে গাড়ীতে তুলে দেয়। সঙ্গে যায় সুমায়া আর নন্দা।

বৌকে হাসপাতালে নেবার টাকা যোগাড় করতে না পেরে সময়মত ঘরে না ফিরলেও বিলাস একসময়ে ফিরে আসে, প্রতিদিনের মত চাকরীর চেষ্টায় বেরিয়ে যতীন একেবারেই ফিরে আসে না।

পরদিন সকালে নন্দা তমালের কাছে আসে। মনে হয় লজ্জায় সে যেন মরে যাচ্ছে!

বলে, শেষকালে আমারি কপালে তোমায় খারাপ খবর জানাবার দায় চাপল।

তমাল বলে, কপালের কথা বাদ দাও। রোজ খারাপ খবর শুনবার জন্য অপেক্ষা করছি অনেকদিন ধরে।

তাই নাকি! তবে ভনিতা না করেই বলি। যতীনবাবু একটা দোকানের ক্যাশ ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়েছেন।

তবু ভাল। জেলে খেতে পরতে পাবে। আত্মহত্যা করে নি, এই অনেক ভাগ্যি।

যাবার সময় উঠানে দাঁড়িয়ে নন্দা হেমাঙ্গের সঙ্গে কথা বলে। দু'জনেই তাকিয়ে ছাখে ছেলেমেয়েকে শুকনো রুটি খেতে দিতে গিয়ে তমালের আজ ঘোমটা খসে পড়েছে!

নন্দা চলে যাবার পর হেমাঙ্গ দরজায় এসে দাঁড়ালেও সে যেন ঘোমটা দিতে ভুলে যায়।

হেমাঙ্গ বলে, আপনি এবার কি করবেন? যতীন যাই করুক, আমাদের কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে।

তমাল বলে, আপনাদের কিসের দায়িত্ব? আমার দায় আপনাদের ঘাড়ে চাপাবার জন্যই উনি আমায় এখানে টেনে এনেছিলেন। আপনারা ভদ্রলোক তাই ওনার সায় পেয়েও আমাকে বিব্রত করেন নি। আমার ব্যবস্থা এবার আমিই করে নেব।

কি ব্যবস্থা করবেন?

দেখি কি করা যায়।

কাছের বস্তি থেকে পঞ্চু দু'বেলা এ বাড়ীতে খাটতে আসে। কলতলায় সে বাসন মাজছিল। তাকে ডেকে তমাল জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ওদিকে ঘর পাওয়া যাবে ভাই?

পঞ্চু চমৎকৃত হয়ে বলে, তা পাওয়া যেতে পারে।

কাজ সেরে যাওয়ার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যেও। ঘরটা দেখে ঠিক করে আসব।

পঙ্কুর কাছে খবর পেয়ে বাড়ীর সকলে ভিড় করে আসে।

সুচারু বলে, কেন বাছা, বস্তিতে উঠে যাবে কি জন্যে? তুমি এ ঘরে থাকলে কি আমরা ফতুর হব!

তমাল বলে, এত ভাড়া কোত্থেকে দেব?

সুভদ্রা বলে, ভাড়া তুমি পাঁচ দশ টাকা যা পার দিও। না দিতে পারলে এখন বাকী রেখো, সময় ফিরলে দেবে।

তমাল মাথা নেড়ে বলে, নাঃ, ওরকম জোড়াতালি দিয়ে কোন ব্যবস্থা হয় না।

দুদিন পরে পাড়ার লোক তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে দ্যাখে বিখ্যাত লাজুক বৌ তমাললতা মাথার কাপড় কোমরে বেঁধে ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিজেই বাসন-কোসন বিছানাপত্র বয়ে নিয়ে বস্তিতে উঠে যাচ্ছে মাথা উঁচু করে!

লজ্জাহীনা বেহায়ার মত!

উপদলীয়

একদিন সকাল বেলা প্রশান্ত নতুন একটি লেখা আরম্ভ করে একমনে লিখে যাচ্ছে, বাইরের এক ছোট সহর থেকে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এল।

প্রশান্ত নামকরা লেখক এবং দরজায় খিল এঁটে জগতকে বর্জন ও নিজেকে ঘরের কোণে নির্ব্বাসিত করে সাহিত্য চর্চ্চায় সে অবিশ্বাসী। লেখার সময় লোকজন প্রায়ই তাঁর কাছে আসে।

সে তাতে খুসীই হয়।

লেখার ব্যাঘাত ঘটার বদলে তাতেই তাঁর লেখা আরও জমে।

মানুষটিকে চেনা চেনা মনে হল। প্রশান্ত অনেক সভা-সমিতিতে যাতায়াত করে, নানা উপলক্ষে বহুলোকের সঙ্গে তার সাময়িক পরিচয় ঘটে। একজনকে দেখে এরকম চেনা চেনা মনে হওয়া নতুন ব্যাপার কিছুই নয়।

আগন্তুক নিজের পরিচয় দিল। তার নাম সুবিনয়, বাস ঐ ছোট সহরে, ওখানে নূতন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়া হয়েছে, সে তার সম্পাদক। সামনের শনিবার তাদের সহরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, সকলের ইচ্ছা এবং দাবী প্রশান্ত সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবে।

প্রশান্ত বলতে গেল, দেখুন—

আপনাকে যেতেই হবে। আমাদের ওখানে প্রতিক্রিয়া কি

জোরালো আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আপনি না গেলে আমরা দাঁড়াতে পারব না।

যেতে আমার অনিচ্ছা নেই। কিন্তু সময় করে উঠতে পারব না।

কিন্তু সুবিনয় নাছোড়বান্দা।

আপনাকে একটু সময় করে যেতেই হবে। আপনারা যদি শুধু কলকাতার বড় বড় মিটিং-এ যান, আমরা দাঁড়াই কোথায়? আমরা বহুদিন থেকে আপনাকে নেবার চেষ্টা করছি, দু'বার আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার না বললে শুনব না।

দু'বার ফিরিয়ে দিয়েছি? এত যায়গা থেকে ডাক আসে—

একটু কষ্ট করে চলুন। ওখানকর সমস্ত লোক আপনাকে দেখার জন্য, আপনার কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। আমরা এখনও ঘোষণা করিনি কিন্তু মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে যে আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

প্রশান্ত একটু চিন্তা করে বলে, আপনাদের যখন এত আগ্রহ, আপনাদের স্নেহের খাতিরে যেতেই হবে।

•

সভা-সমিতির সময় নিয়ে বাংলায় একটা অদ্ভুত, সর্ব্বজন-বিদিত প্রকাশ্য ফাঁকি গড়ে উঠছে—সর্ব্বত্র। সভা যারা ডাকে তারা হিসাব করেই আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা হাতে রেখে সভার সময় ঘোষণা করে, সভায় যারা আসে তারাও সেই হিসাবেই আসে।

একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে।

বিষ্ণুপদ নামে একটি যুবক প্রশান্তকে নিতে এসেছিল। পথে তাকে প্রশান্ত বলে, এটা হল একটা রোগের উপসর্গ। যাঁরা সভা ডাকেন আর যাঁরা সভায় আসেন তাঁদের মধ্যে একটা কৃত্রিম দূরত্বের লক্ষণ।

এ দূরত্ব যদ্দিন না ঘুচছে, হাজার চেষ্টা করেও ফাঁকিটা দূর করা যাবে না।

বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে সায় দেয়।

তোমাদের টাইম কটায়?

বিষ্ণুপদ পকেট থেকে একটা ছাপানো হ্যাণ্ডবিল তার হাতে দেয়। সবচেয়ে বড় হরফে তার নাম ছাপানো হয়েছে। সভার স্থান গোবিন্দ মেমোরিয়াল হল, সময় বৈকাল পাঁচটা।

বিষ্ণুপদ জানায় তারা শুধু ছাপা হ্যাণ্ডবিল বিলি করেনি, হাতে লিখে অনেক পোষ্টারও চারদিকে লাগিয়েছে।

সব চেয়ে বড় হরফে তার নাম ছাপানোর জন্য নয়,—নামের মোহ তার কেটে গেছে অনেকদিন আগেই—অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য এদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা প্রশান্তকে খুসী করে। সভায় বহু লোকের সমাবেশটাই তার কাম্য। এরকম অনুষ্ঠানের সার্থকতার দিক থেকে তো বটেই, সেটাই প্রথম আর প্রধান কথা, তার নিজের দিক থেকেও বটে।

তার অসম্ভব খাটুনি। অল্প লোকের ছোট সভায় বলতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়, এতখানি সময় লেখার পিছনে দিতে পারলে তার বক্তব্য আরও কত বেশী মানুষকে সে পড়াতে পারত।

চারটের পর ট্রেন ছোট ষ্টেশনটিতে পৌছায়।

প্রশান্তকে অভ্যর্থনা করার জন্য কয়েকজন ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল। খানিক কথাবার্তার পর তাঁরা সাইকেল রিক্সায় গোবিন্দ মেমোরিয়াল হলের দিকে যাত্রা করে। যেতে যেতে প্রশান্ত লক্ষ্য করে, বেশ আঁটোসাটো ঘনবদ্ধ ছোটখাট সহরটি। আশে পাশে কয়েকটা কারখানার চিমনি মাথা উঁচু করে আছে।

এখন সভায় গিয়ে বসে লাভ নেই। সাড়ে পাঁচটার আগে

সভার কাজ আরম্ভ হবে না, ছটাও বেজে যেতে পারে। গোবিন্দ মেমোরিয়াল হলটি বেশ বড়। ফেষ্টুন ও পোষ্টার দিয়ে ভাল করে সাজানো হয়েছে। হলের পিছনের দিকে ছোট লাইব্রেরী ঘরটিতে বসে প্রশান্ত অপেক্ষা করতে করতে সভার উদ্যোক্তা দু'তিনজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে।

আধ ঘণ্টা পরে মাইক ফিট করার আওয়াজ কানে আসায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, মাইক এনেছেন?

মাইক ছাড়া কি মিটিং হয় আজকাল?

এরা তবে সভায় বহু লোক সমাগম আশা করছে। প্রশান্ত খুসী হয়। এই তো চাই। বৃহত্তম জনতার সঙ্গে আত্মীয়তাই তো প্রগতির আসল কথা।

জন সমাবেশের কলরবের সঙ্গে বহুদিন থেকে তার ঘনিষ্ট পরিচয়। পৌনে ছ'টা বাজে অথচ হলে যে বেশী লোক জমেছে লাইব্রেরী ঘরে বসে তা টের পাওয়া যায় না।

আরও কয়েক মিনিট পরে সভার কাজ আরম্ভ করার জন্য হলে এসে প্রশান্ত প্রায় স্তম্ভিত হয়ে যায়।

ছেলে বুড়ো মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে হলে শ্রোতার সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী হবে না। আরও বিশ পঁচিশজন এদিক ওদিক ঘোরাফিরা করছে, সভার কাজ আরম্ভ হলে আসন গ্রহণ করবে।

সভার একজন উদ্যোক্তাকে সে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার? একেবারেই তো লোক হয় নি? সে জবাব দেয়, সংস্কৃতির ব্যাপারে একেবারে উদাসীন এখানকার লোক।

অথবা আপনাদের সংস্কৃতির ব্যাপারে উদাসীন?

আমরাই তো এখানে সংস্কৃতি করি!

জবাবটা মোটেই তার পছন্দ হয় না। স্থানীয় লোক সংস্কৃতির

ব্যাপারে একান্ত উদাসীন হলে এবং শুধু এরাই সংস্কৃতি করলে—কাদের নিয়ে কাদের জন্য কি সংস্কৃতি এরা করে বোঝা বড়ই কঠিন।

সভাপতির আসনে বসে সে মুষ্টিমেয় শ্রোতাদের দিকে তাকায়। আশ্চর্য্য, দুর্ব্বোধ্য লাগে ব্যাপারটা তার কাছে। এর চেয়ে কত ছোট যায়গায় সভায় গিয়েছে, হ্যাণ্ডবিল পোষ্টার মাইকের সমারোহ ছাড়াই এর বিশগুণ লোক সভায় হাজির হয়েছে। সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন হোক—যদিও সেটা কি রকম উদাসীনতা সে কল্পনা করতে পারে না—তাঁর নামের কোন আকর্ষণও কি এই সহরের লোকের কাছে নেই ? এতো বিনয় বা অহঙ্কারের কথা নয়—নাম করা সাহিত্যিকের নামের আকর্ষণ একটা স্বাভাবিক বাস্তব সত্য। যে লোকটা বই লিখে এত নাম করেছে লোকে তাকে স্বভাবতই দেখতে চায়, তার কথা শুনতে চায়। অথচ এত পোষ্টার হ্যাণ্ডবিল সত্ত্বেও এ সভায় যত লোক এসেছে তার অর্দ্ধেকের বেশী উদ্যোক্তা এবং সংগঠনের সঙ্গে কোন ও না কোন ভাবে যুক্ত ধরে নিলে সাধারণ শ্রোতার সংখ্যা দাঁড়ায় নামমাত্র !

প্রশান্ত একটু ঝিমিয়ে যায়, অস্বস্তি বোধ করে। এমন একটা ধাঁধায় পড়ে গেলে নিরুৎসাহ না হয়ে অস্বস্তি বোধ না করে মানুষ পারবে কেন !

অনেকটা যন্ত্রের মত সভার কাজ চালিয়ে যায়, দেরীতে সভা আরম্ভ করার ওজুহাতে প্রোগ্রাম ছেঁটে ছোট করে দেয়, অল্প কথায় ভাষণ দিয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলে।

আটটার গাড়ীতে সে ফিরে যাবে।

-

সাইকেল রিক্সায় ষ্টেশনের দিকে চলতে চলতে দূর থেকে তার কানে ভেসে আসে লাউডস্পীকারের ক্ষীণ আওয়াজ। রিকসা

যত এগিয়ে যায় ষ্টেশনের দিকে লাউডস্পীকারের বক্তৃতার আওয়াজ তত স্পষ্ট হয়।

ওখানে কি হচ্ছে?

তাকে ষ্টেশনে পৌছে দিতে যে ছেলেটি সঙ্গে যাচ্ছিল, সে বলে, একটা মিটিং হচ্ছে।

মিটিং? কিসের মিটিং?

দুর্ভিক্ষ, চোরাকারবার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এই সব নিয়ে।

প্রশান্ত একটা নিশ্বাস ফেলে।

পরম স্বস্তির নিশ্বাস। না, বাস্তব হঠাৎ অবাস্তব হয়ে যায় নি, সত্য হঠাৎ ধাঁধায় পরিণত হয় নি।

সব ঠিক আছে।

ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে ভিড় ঠেলে রিক্‌সা এগোতে পারে না, তাদের নেমে যেতে হয়। ষ্টেশনের কাছে ফাঁকা মাঠে বিরাট এক জন-সমাবেশ হয়েছে, রাস্তায় পর্য্যন্ত ভিড় উথলে এসেছে। ষ্টেশনে নামবার সময় মাঠটা ফাঁকা দেখে গিয়েছিল।

প্রশান্তও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। বক্তৃতা শোনেন ।

আপনার গাড়ীর কিন্তু দেরী নেই।

পরের গাড়ীতে যাব।

এদিক ওদিক

দু'জনে প্রতিবেশী, সমবয়সী এবং বন্ধু। কিন্তু জীবনটা দুজনের গতি নিয়েছে দুদিকে। মাধব মেকানিকের কাজ শিখে ঢুকেছিল মোটর মেরামতের কারখানায়, সে সেইখানে সেই কাজেই লেগে আছে। শরৎ লেগেছিল অল্প বেতনের একটা কেরাণীগিরি চাকরীতে, বিনা নোটিশে ছাঁটাই হয়ে সে দিয়েছে ছোটখাট একটা মনোহারি দোকান।

মাধবের মোটর মেরামতি কারখানার কাছাকাছিই তার দোকান, তাদেরই বাড়ীর দিকে যাবার গলির মোড়ে বড় রাস্তার উপর একটা মুদিখানার পাশে।

মুদিখানাটা বুড়ো নগেনের। দোকান খোলার সময় শরৎ ঘোষণা করেছিল আশপাশের কাউকে আর কোন সাধারণ বা সৌখীন জিনিষ কিনতে সহরে ছুটতে হবে না, সহরতলীর তার এই দোকানে কলকাতার দামে সকলে সব জিনিষ পাবে।

জোর গলায় বলেছিল, সকলে পরখ করে গ্যাখো। মাল আনার খরচ হিসেবেও যদি দুটো পয়সা বেশী ধরেছি প্রমাণ করতে পারে কেউ, সকলের সামনে নিজের কান কেটে ফেলব।

মাধব বলেছিল, কেন? কিছু কিনতে সহরে যাওয়া-আসার খরচ নেই? তোমার দোকানে পেলে লোকে খুশী হয়ে দু' চার পয়সা বেশী দেবে না!

শরৎ হেসে বলেছিল, ও হিসাব ভুল। কত লোককে কত ধান্ধায় সহরে যেতে হয় দেখিস না? কাজে যাবে দরকারী জিনিষটা কিনে

আনবে—নিজের আনবে অন্যের আনবে। জিনিষ আনতে বেশী খরচ লাগবে কেন?

মাধব ভেবে-চিন্তে বলেছিল, তাহলে কলকাতার দরে দিলেও দামী মাল তোর দোকানে কেউ কিনবে না। সহরের বড় দোকান থেকে কিনবে।

দেখা যায় মাধবের কথাই ঠিক।

লোকে সাবান, চিরুনী, চা, খাতা, পেন্সিল এসব টুকিটাকি জিনিষ কেনে তার দোকান থেকে, কিন্তু একটু বেশী দামী জিনিষের দরও জিজ্ঞাসা করে না,—দু'একজন ছাড়া। চেনা লোক যারা তাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল, তারাও ওসব জিনিষ কলকাতা থেকে কিনে আনে।

দামী জিনিষ দোকানে রাখা বন্ধ করতে হয়েছে শরৎকে।

সহরের দরে জিনিষ বেচার নীতিও তাকে ছাড়তে হয়েছে।

নগেন বলেছিল, তবেই আপনি দোকান চালিয়েছেন দাদা! শুধু মাল আনার খরচ নাকি? সহরের বড় দোকানে ধারে কারবার নেই, আপনাকে ধার দিতেই হবে। আদায় করা কি ঠেলা, টের পাবেন। কিছু টাকা আটকে থাকবেই সব সময়, লগ্নী টাকার মত। সুদ যদি না ধরেন তবে লাভ করবেন কি?

শরৎ জোরের সঙ্গে বলেছিল, আমি কাউকে ধার দেব না, ঘরের লোককেও নয়।

বুড়ো নগেন ফোকলা মুখে হেসেছিল।

ধারে মাল বেচতে হয়েছে শরৎকে, হিসাব করে দু'চার পয়সা দাম বেশীও ধরতে হয়েছে। ধারে মাল না দিলে অর্ধেকের বেশী খদ্দের তার দোকানে আসবে না, খানিক তফাতে রসিকের দোকানে যাবে। রসিক ধারে দেবে।

চাকুরে বাবু মাসের শেষের দিকে এসে চায়ের একটা প্যাকেট চায়, প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলে, মাসকাবারে দামটা দেব।

চায়ের প্যাকেটটা তখন তাকে ধারে দিতেই হবে। কারণ, সত্যই তার হাত খালি, শাকপাতার দৈনিক বাজারটা ক'দিন কি দিয়ে চালাবে তাই তাকে ভাবতে হচ্ছে।

মেয়েরা ছেলেকে পাঠাচ্ছে দোকানে, ছেলে জিনিষ নিয়ে বলছে, বাবা এসে দাম দেবে।

যারা চাকুরে নয়, এলোমেলোভাবে যাদের রোজগার, যাদের বেশ কিছুদিন পরে পরে থোক টাকা রোজগার, বরাবর নগদ কিনে এসে হঠাৎ কোন কারণে সাময়িকভাবে যে নগদ কিনতে পারছে না, তাদেরও ধার দিতে হয়।

বছরখানেক দোকান চালিয়ে কাবু হয়ে পড়েছে শরৎ। যা কিছু সম্বল ছিল সব সে ঢেলেছে এই দোকানে, এক বছর দোকান চালিয়ে লাভ হওয়ার বদলে গেছে লোকসান।

শুধু ওই ধার দেওয়ার জন্য।

কয়েকজনের কাছে বহুকাল অনেক বাকী পড়ে আছে, চেষ্টা করেও টাকা আদায় করতে পারে নি।

কানু আর নগেন দুজনেই সাবধান করে দিয়েছিল, ধারে মাল দিতেই হবে কিন্তু লোক বুঝে দিও—সময়মত হোক দেরীতে হোক, টাকাটা যেন আদায় হয়।

এক বছরে অভিজ্ঞতা জন্মেছে অনেক কিন্তু আজও সে বুঝতে পারে না ওই লোক বুঝে ধার দেওয়ার নীতিটা কি!

কে জানে সুভদ্রা ভাণ্ডারের রসিক কোন মাপকাঠিতে লোক বুঝে ধার দিয়ে দোকান চালিয়ে লাভ করছে।

যাদব দোতলা বাড়ীর মালিক, বেশ বড়লোকী চালে তার সংসার চলে, সে একদিন দোকানে পা দেওয়ায় কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল শরৎ।

যাদব প্রায় হুকুমের সুরে বলেছিল, একটা হিসেব খোল আমার নামে। বাড়ীতে হাজার জিনিষের দরকার, খুচখাচ পয়সা দেবার ঝন্‌ঝাট পোষায় না আমার। আমি স্লিপ পাঠাবো, বিশ-ত্রিশ টাকা হলে হিসাব পাঠিয়ে দিও।

উল্লসিত হয়ে উঠেছিল শরৎ। এতবড় একজন খদ্দের পাওয়া সহজ ভাগ্যের কথা!

দশ-বার দিনেই ত্রিশ টাকার উপরে উঠে গিয়েছিল যাদবের কাছে পাওনা।

শরৎ সসঙ্কোচে নিজেই গিয়েছিল হিসাব নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাদব তার উল্লাস বাড়িয়ে দিয়েছিল শতগুণ।

মনোহারী দোকান হলেও শরৎ তেল মশলা ঘি ইত্যাদি কয়েকটা মুদিয়ালী জিনিষও দোকানে রাখে। যাদব সবরকম জিনিষের জন্যই তার দোকানে স্লিপ পাঠায়।

মাসে প্রায় শ'খানেক টাকার মাল কেনার খদ্দের!

মাস তিনেক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার হিসাব দাখিল করা মাত্র টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাদব সেদিন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, তুমি বড় জ্বালাচ্ছ আমাকে। মাসে দশবার হিসাব পাঠালে অসুবিধা হয় না আমার? একেবারে মাসকাবারে হিসাব দেবে।

আজ্ঞে ছোট দোকান, মাল আনাতে হয়—

তবে কাজ নেই, আমি অন্য কোথাও হিসাব খুলব।

বেশ, মাসে মাসেই হিসাব দেব আপনাকে।

মাসকাবারে একশ' তেইশ টাকা সাত আনা তিন পয়সার হিসাব

নিয়ে হাজির হলে যাদব বলেছিল, আজ তো তোমায় টাকা দিতে পারছি না। সাত তারিখে পাবে।

জিনিষের প্রয়োজন যেন আচমকা বেড়ে যায় যাদবের সংসারে। সাত তারিখের মধ্যে দু'দফায় আড়াই সের করে পাঁচ সের তেলই নিয়ে যায় যাদবের চাকর।

দু'শো টাকার কাছে গিয়ে পৌছায় তার কাছে শরতের দোকানের পাওনা।

সাত তারিখে গিয়ে শরৎ যাদবের দেখা পায় না। চাকর জানায় বাবু বড় ব্যস্ত, টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

সে টাকা আজও আদায় হয় নি!

নিজের দোতলা বাড়ী, দামী আসবাবে সাজানো বৈঠকখানা, বাড়ীতে চাকর আছে, মেয়েরা সাজে-পোষাকে সহরতলীকে লজ্জা দিয়ে বেড়াতে যায় সিনেমায় যায়—লোক বুঝে ধার দেবার হিসাবটা এক্ষেত্রে সে কি হিসাবে খাটাত?

নগেন বলে, আমি কি ছাই জানি তোমার কাছে ধারে মাল নিচ্ছে? ধারে কাউকে দেবে না বললে, আমি ভাবলাম নগদ নিচ্ছে বুঝি। মোর সাঁইত্রিশ টাকার পাওনা দেয় নি পাঁচ মাস।

শরৎ অবাক হয়ে বলে, মোটে সাঁইত্রিশ টাকা?

কাজে যাওয়ার পথে দু'পয়সার নস্য কিনতে মাধব দোকানে এসেছিল। সে বলে, তোমার দ্বারা দোকান চলবে না। ভদ্দরলোকের ছেলে, চাকরী-বাকরী করগে। এতটুকু দোকান তোমার, কি হিসেবে একজনকে তুমি দুশো টাকার মাল ধারে দিলে? সে রাজা হোক, লাটসায়েব হোক—তোমার তো ছোট দোকান? ধারে এত টাকার মাল তুমি দেবে কেন?

নগেন বলে, ঠিক কথা, ন্যায্য কথা। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

ভাবলে যে মস্ত খদ্দের, মোটা লাভ হবে। তোমার মত বোকাদের ঠকিয়েই ওর যত চাল, যত বড়লোকামি।

শরৎ ম্লান মুখে বলে, তোমার সাঁইত্রিশ টাকা আদায় হয়েছে দাদা ?

অনেক কষ্টে হয়েছে। রাস্তায় পেয়ে একদিন রেগে-মেগে চেঁচিয়ে আচ্ছা করে গালাগালি দিলাম। জানি তো লোক দেখানো চালটাই আসল, চাল নষ্টের ভয়ে তটস্থ। ধমক দিয়ে বললে, চেঁচাচ্ছ কেন ? আমি কি জানি তোমার দোকানে বাকী আছে ? বাড়ী ফিরেই তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব।

ফোকলা মুখে নগেন হাসে।

পাঁচ মাসে কতবার তাগিদ দিয়েছি, বাবু জানেন না দোকানে বাকী আছে! সেইদিন সন্ধ্যাবেলা পাওনা পেয়ে গেলাম।

হাসি মুছে যায় নগেনের মুখের। বলে, তবে কিনা, মোকে জব্দ করতে চায়। অনেক বড় বড় ঝনঝাটে সময় পায় না, নইলে অ্যাদ্দিনে মোর ভারি অনিষ্ট করত।

শুধু এরকম নয়। সুনীল চাকরী করছিল, মাসের কুড়ি বাইশ তারিখ থেকে সে ধারে মাল নিত। যা নিলে নয় শুধু সেইরকম মাল। দোকানে বাকী যত কম হয় তারই জন্য যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা।

পরের মাসে দু'তিন তারিখে এসে বাকী পাওনা মিটিয়ে দিত। বলত, এ মাসে তোমার কাছে আর ধারে কিছু কিনব না। তুমি বড় বেশী দাম ধরছ জিনিষের।

শরৎ বলত, ধারে দিতে হলে দাম দু'এক পয়সা বেশী ধরতে হয়, বোঝেন তো ?

সাত-আট মাস এমনি নিয়মিতভাবে সুনীল তার দোকানে ধার করেছে, মাইনে পেয়েই মিটিয়ে দিয়েছে সব পাওনা। ছাঁটাই হবার

পর সে কথাটা গোপন রেখে মাসকাবারে সে বলেছিল, এ মাসের মাইনে পেতে কয়েকদিন দেরী হবে।

অনায়াসেই সে আরও কয়েকদিন যাদবের কায়দায় বেশী বেশী মাল নিয়ে বাকী পাওনাটা বাড়িয়ে দিতে পারত—কয়েকটা দিন চালিয়ে দেবার মত যোগাড় করে রাখতে পারত তেল মশলা ইত্যাদি দরকারী জিনিষ।

কিন্তু সে আর এক পয়সাও বাকী কেনে নি।

বাকী টাকাটাও শোধ দিতে আজ পর্যন্ত আসেনি। ছেলেমেয়ে নিয়ে তার কি অবস্থা শরৎ জানে। তাগিদ দিতে প্রাণ চায় না। এতো জানা কথাই যে তাগিদ দিয়ে লাভও কিছু নেই!

এমনি আরও কতজন।

কেউ হয় তো পনের-বিশ টাকা বাকী রেখেছে। কিন্তু মাসে পাঁচ টাকার মাল কিনছে। কোন মাসে পাঁচ টাকা ধার বেড়ে যায়, কোন দশ মাসে পাঁচ টাকা ধার কমে যায়।

বাকী না বাড়িয়ে নিয়মিত জিনিষ কিনছে। এরা না কিনলে দোকান তার বন্ধ করতে হবে।

যাদব আর তারই মত শাঁসালো পাঁচ-ছটি খদ্দের মোটা টাকা বাকী রেখে দোকানে কেনাকাটাই প্রায় বন্ধ করেছে। দোকান তার চালু রয়েছে এই পাঁচ-দশ-বিশ টাকা বাকীওয়ালাদের জন্য।

বাকী শোধ না করতে পারার লজ্জায় ওরা নগদ দিয়ে যা-কিছু কিনতে পারে, তার দোকান থেকেই কেনে। টাকা প্রতি সে দু'পয়সা দাম বেশী ধরছে জেনেও কেনে।

রতন ধারে প্রায় পনের টাকার মত। বয়স তার বিশ বছরের বেশী নয়, পাঁচজনের একটা অচল সংসার চালু রাখতে না পারলেও ধ্বংস হওয়া ঠেকিয়ে চলছে।

সে সরলভাবে বলে, আপনার ধারটা নিশ্চয় দেব শরৎদা, দু'এক মাসের মধ্যে দেব। বৌদি ছেঁড়া কাপড় পরে আছে আজ দেখেছি। কদ্দিন বাদে রায়বাবুদের ওই পুকুরের কোণায় পেয়ারা গাছে উঠেছি, বৌদি এসে বললে, আমায় দু'টো পেয়ারা দেবে? দেখলাম শাড়ীটা নশো জাগায় ছিঁড়ে গেছে—নশো জাগায় সেলাই হয়েছে।

রতন দুটো সিগারেট কেনে। একটা সযত্নে পকেটে রেখে একটা ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমার টাকা কটা বাকী আছে বলেই কি বৌদিকে একটা শাড়ী দিতে পারছ না শরৎদা?

এভাবে যে কথা বলে ব্যবহার করে, পনেরটা টাকা বাকী আদায়ের জন্য তাকে কি গাল দেওয়া যায়?

যাদবদের মত শাঁসালো লোকদের কাছে সে যখন দেড়শ' দু'শ টাকা বাকী আদায়ের জন্য সবিনয়ে সসঙ্কোচে ভিখারীর মত দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, দেখা হবে না শুনেও রাগ না করে ফিরে আসে?

দোকান বন্ধ করে সে যখন বাড়ী ফেরে, পাড়ার ঘরে ঘরে ঘুম তখন ঘনিয়ে এসেছে, তার তিনটি ছেলেমেয়ে অচেতন হয়ে গেছে ঘুমে। শিবানীও হাই তুলছে ঘন ঘন।

শিবানীর পরনে সত্যই ছেঁড়া কাপড়, মাধব মিছে বলে নি।

মনোহারী মণিহারী দোকান করতে তার গয়নাগুলিও লেগেছে, তার শুধু ছেঁড়া শাড়ী দিয়ে লজ্জা নিবারণের সমস্যা নয়।

শিবানী বলে, এখন খাবে?

শুকনো রুটি আর ছেঁচকি তো? খাব'খন। তুমি এতক্ষণ কি করছিলে?

শিবানী মুখ বাঁকায়।

কি আবার করব? ওরা খানিকক্ষণ পড়ল, তারপর খেয়েদেয়ে

ঘুমিয়ে পড়ল। কারো পেট ভরে না। খালি বলে, আরেকটা রুটি দাও, একটু চিনি দাও—কোত্থেকে দিই বল তো? রোজ আমার ওপর রাগ করে ঘুমোয়।

শরৎ কথা বলে না।

রমা এসেছিল, ওর সঙ্গে কড়ি খেললাম। ও বেচারারও সময় কাটে না। মাধববাবু কাজ থেকে এসে আবার বেরিয়ে যায়, মিটিং-ফিটিং করে ন'টা দশটায় ফেরে। কিন্তু তবু কি হাসি খুসী মেয়েটা, রোজ রোজ এসে প্রাণ জুড়িয়ে দিয়ে যায়। ও না এলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম!

একেই বলে তিরস্কার। একেই বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া।

মাথা ঘোরে। শরীরে বিশ্রী অস্বস্তি আর অস্থিরতা। দোকানটার প্রথমদিকে মালপত্রে ভরাট একটি জমজমাট চেহারা ছিল, আজকাল কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। অনেকরকম জিনিষ টাকার অভাবে দোকানে এনে রাখা যায় না। খদ্দের ফিরিয়ে দিতে হয়।

হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে হ্যাট-কোট পরা যাদব দোকানে এসে তাকে আশ্চর্য্য এবং অভিভূত করে দেয়।

যাদব বলে, তুমি দুশো টাকার মত পাবে না? কাল সকালে গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসো।

বুকটা ধরাস ধরাস করে। সেই যেন মস্ত একটা অপরাধ করেছে যাদবের কাছে, এতগুলি টাকার পাওনাদার হয়ে।

যাদব বলে, একটিন সিগারেট দাও তো। এক পাউণ্ড চা দাও। ভেজিটেবল ঘিয়ের দশ পাউণ্ড টিন নেই? আচ্ছা পাঁচ পাউণ্ড টিন একটা দাও। আরও তিন-চারটে জিনিষ যাদব নেয়। হাতের সুদৃশ্য

চামড়ার কেসটির ভিতর থেকে একটা কাপড়ের থলি বার করে জিনিষ-গুলি তার মধ্যে ভরে নিয়ে চলে যায়।

বলে যায়, কাল যেও—দশটা নাগাদ।

শরৎ দাঁড়িয়ে থাকে পুতুলের মত। অচেনা একজন খদ্দের এসে নতুন চকচকে একটা দোয়ানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দু'পয়সার নস্যি দিন তো।

শরতের যেন চমক ভাঙ্গে।

নগদ দামে দু'পয়সার নস্যের খদ্দেরকে বিদায় করেই সে বন্ধ করে দোকান! এগিয়ে যায় হরেনের মোটর গাড়ীর মস্ত হাসপাতালটার দিকে।

প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য রমা না এলে শিবানী না-কি পাগল হয়ে যেত। মাধবের সঙ্গে খানিকক্ষণ দহরম-মহরম না চালালে সেও আজ পাগল হয়ে যাবে।

কারখানায় একটা শূন্যে তোলা গাড়ীর তলায় আধ-শোয়ার মত বাঁকা হয়ে বসে মাধব গাড়ীটার হৃদ্‌পিণ্ডে কি একটা অপারেশন চালাচ্ছিল।

নিশ্চয় কঠিন অপারেশন।

শরৎ ডাকতে মাধব বলে, দাঁড়া।

বলে' প্রায় বিশ মিনিট নিঃশব্দে একমনে ইঞ্জিনটার চিকিৎসা চালিয়ে যেন চটেমটেই উঠে আসে।

গজ গজ করতে করতে বলে, ব্যাটারা যত ধ্যাধ্যেরে পচা মড়া গাড়ী এনে দেবে—মাধব সারিয়ে দাও!

কেন, গাড়ীটা তো নতুন মনে হচ্ছে।

গাড়ীর বাইরেটা নতুন রং করা, ইঞ্জিনটা ঠাকুর্দার চেয়ে বুড়ো রদ্দি জিনিষ।

হরেন মোটা চুরুট টানতে টানতে এসে বলে, কাল গাড়ীটা ছাড়া যাবে তো মাধব ? অন্যের বেলা যাই হোক, ধীরেনবাবুকে কিন্তু চটানো যাবে না।

মাধব বলে, কালকেই ছেড়ে দেবেন গাড়ী। বলবেন গাড়ীটার যেন শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন।

হরেন চটে বলে, কি রকম ?

মাধব বলে, মানুষ মরে গেলে ডাক্তার তাকে বাঁচাতে পারে ? তার তখন শ্রাদ্ধ করতে হয়। এ গাড়ীটা মরে ভূত হয়ে গেছে।

হরেন খানিকক্ষণ কটমট করে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তুমি আমাকে ডোবালে মাধব ! আমার অবস্থাটা বোঝ না কেন ?

হরেনের সিগারের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন একটানে বিড়িটা পুড়িয়ে ফেলে মাধব বলে, বুঝতে স্থান না, তাই বুঝি না। যাক গে বাবু, কাল হপ্তা পাই নি আজ দিয়ে দিন।

শরৎ লক্ষ্য করে জন-ত্রিশেক মিস্ত্রী কারিগর খানিক তফাতে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন সারা সপ্তাহ কাজ করেও হপ্তা পাবার জন্য তাদের এতটুকু ব্যগ্রতা বা উগ্রতা নেই।

হরেন একবার মাধবের দিকে একবার ওদের দিকে তাকায়।

আজ বোধ হয় হবে না।

আজ চাই বাবু।

হরেন মিনিটখানেক চুপ করে থেকে কর্মচারীকে বলে, সুধীর— এদের হপ্তা দিয়ে দাও। সেই টাকাটা থেকেই দাও।

তেল-কালি মাখা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি ছেড়ে ধুতি আর সার্ট পরে মাধব শরতের সঙ্গে রাস্তায় নামে।

বলে, দোকান ফেলে এ সময় এলি ?

শরৎ বলে, দোকান আর চালাব না। যাদববাবু ফের আজকে প্রায় দশ টাকার মাল ধারে নিয়ে গেল।

নিয়ে গেল ? না তুই দিয়ে দিলি ?

শরৎ চুপ করে থাকে।

মাধব বলে, কাল দশটায় যেতে বলেছে তো ? কাল ছুটি আছে, আমি তোর সাথে যাব।

বেলা দশটায় যাওয়ার কথা ছিল, মাধব ন'টার আগেই শরৎকে ডেকে নিয়ে যাদবের বাড়ী যায়।

দরজা খুলে চাকর বলে, এখন বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।

অর্থাৎ যাদব দেখা করবে না। জানালা দিয়ে দেখা গিয়েছিল যাদব বাইরের ঘরেই বসে আছে।

মাধব কথা না বলে চাকরের পাশ কাটিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে যায়, পিছনে যায় শরৎ।

যাদব কটমট করে তাকায়।

মাধব ধীরে সুস্থে একটা চেয়ার টেনে বসে বলে, ওর কাছে আমি তিনশ' টাকা পাব যাদব বাবু। আপনি আজ ওর দোকানের পাওনা মিটিয়ে দেবেন বলেছেন, তাই সাথে এলাম। বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া কি ঝকমারি কাজ বলুন দিকি ? ঘরে আমার রেশন আনার পয়সা নেই।

যাদব একবার মাধবের দিকে, একবার শরতের দিকে তাকায়।

আজ হবে না। কাল দেব।

আজকেই চাই বাবু।

যাদব খানিক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে ভিতরে চলে যায়। ফিরে

এসে পঞ্চাশটা টাকা শরৎকে দিয়ে বলে, আজ এর বেশী দিতে পারছি না। বাকীটা সামনের সপ্তাহে দেব।

শরৎ বলে, আবার সামনের হপ্তায় ?

মাধব বলে, যাক গে। তাই দেবেন, দু'জনেই আসব। বাকীটা সব একেবারে না পারেন, এমনি পঞ্চাশ-ষাট করে মিটিয়ে দেবেন কয়েক দফায়।

বাইরে গিয়ে মাধব বলে, আর কার কার কাছে বাকী আছে, চ' ঘুরে আসি। হয়েছিস দোকানদার মানুষ, মেয়েমানুষের মত করিস কেন বল দিকি ?

এপিঠ ওপিঠ

সকালের ডাকে চিঠিখানা আসে।

অবনী তখন কয়েকটা টাকার সন্ধানে বেরিয়েছে। অন্যভাবে সন্ধান পাওয়া অবশ্য মস্ত একটা যদির কথা, পকেটে তাই তমালের আরেকটা সোনার জিনিষও নিয়ে গেছে।

এমনি না পেলে ওটা বাঁধা রেখে বা বিক্রী করেই টাকা আনবে। টাকা আজ চাই-ই, নইলে ছেলেমেয়ে দু'টিকে নিয়ে তাদের উপোস একেবারে বাঁধা।

টাকা না আসা পর্য্যন্ত যে উপোস থামবে না। কাল রাত্রি পর্য্যন্ত অন্যভাবে চেষ্টা করে আজ সকালে অগত্যা সোনার জিনিযটা নিয়েই বেরোতে হয়েছে অবনীব।

বেরিয়েছে বলেই কার্ডখানা তমালের হাতে পড়ে। কে কি লিখেছে দেখে এবং চিঠিখানা পড়ে খানিক অবাক হয়ে থাকার পর সেটা তমাল নিজের ভাগ্য বলে ভাবে।

এতদিন পরে নিজে থেকে রমণী ভাইকে চিঠি লিখেছে! সংক্ষিপ্ত হলেও চিঠি! বহুদিন তাদের কোন খবর পায় না, তাই কুশল জানতে চেয়েছে।

তবু এ তো রমণীর যেচে লেখা চিঠি। এ চিঠি হাতে পড়লে অবনীর মনস্থির করে ফেলতে আর এক মুহূর্তও দেরী হবে না।

তাদের সকলকে টেনে নিয়ে অবনী তার বড ভায়ের বাড়ীতে তুলবে। চাকরী পাওয়ার আগের দিনগুলির অপমান আর নির্য্যাতন, বড় জা বেলার ঝাঁটা মারা ব্যবহারে রোজ তার কাঁদাকাঁটা, চাকরীটা

পাবার পর তাদের ফোঁস করে ওঠা আর দুভাই দু'জায়ের মধ্যে অকথ্য কুৎসিৎ ঝগড়ার পর তাদের চলে আসা—সব অবনী ভুলে যাবে।

এ চিঠি পাবার দরকার হয় নি, এভাবে রমনীর জানাবার দরকার হয় নি যে পুরাণো বিবাদ সে ভুলে গেছে কিন্তু ছোট ভাইকে ভুলে যায় নি—এমনিতেই ওসব তুচ্ছ হয়ে গেছে অবনীর কাছে।

শুধু তার জন্যে পারে নি, নইলে একমাস আগেই সে তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে মাথা নীচু করে ভিখারীর মত দাদার আশ্রয়ে গিয়ে উঠত।

কাল রাত্রেও এই নিয়ে তাদের ঝগড়া হয়ে গেছে। আজ থেকে যে সুনিশ্চিত উপোস সুরু হওয়ার কথা ঠেকাবার ব্যবস্থা করতে না পেরে শ্রান্তক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরে একটু ছেঁচকি দিয়ে শুকনো দু'খানা রুটি খাবার পর।

অবনী বলেছিল, তোমার কেবল ফাঁকা বাহাদুরি! মায়ের পেটের ভাই, গুরুজন, তার কাছে দু'একমাস আশ্রয় নিলে কি এমন আসে যায়? তোমার মান ধুয়ে জল খেলে বাচ্চাদেব পেট ভরবে?

বাচ্চাদের পেট! তার যেন পেট ভরাবার প্রয়োজন হয় না, তমালেরও নয়!

অবনী আরও বলেছিল, তোমাদের বোঝা টেনে টেনে আরও কিছু করতে পারছি না। দু'মাস একটু রেহাই পেলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারতাম।

সবই ঠিক কথা। কাঁহাতক আর এভাবে টানতে পারে মানুষ? আজ আট মাসের উপর চাকরী নেই, রোজগার নাই।

কিন্তু এ অবস্থাতেও তমাল কি করে ভুলবে দীর্ঘদিন ধরে অবনীর

মায়ের পেটের ভাই আর তার বৌয়ের ব্যবহার, অবনী একটা চাকরী পাওয়ামাত্র ওদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার?

আজ বিনাদোষে হলেও সেই চাকরী খুইয়ে কি করে আবার ফিরে যাবে ওই চাকুরে ভাইয়ের বাড়ী? বেলা যে কি ভাবে মুখ বাঁকিয়ে তার দিকে তাকাবে শুধু এইটুকু ভাবতে গেলেই যে গায়ে তার বিছার কামড় লাগে!

তার চেয়ে গাছতলা ভাল। না খেয়ে মরা ভাল।

সে তাই অবনীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে এটা তার মানের কথা নয়। ভায়ে ভায়ে সম্পর্কটা যদি তাদের সাধারণ হত, সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে তারা আর দশটি ভায়ের মত ভিন্ন হয়ে যেত, সে হত একেবারে আলাদা ব্যাপার।

কিভাবে তাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল সেটা তো ভাবতে হবে। ভাই বলেই কি আর জোড়া লাগে? গিয়ে কোন লাভ নেই। বরং রাস্তার লোককে রমণী আশ্রয় দেবে, তাদের লাথি মেরে তাড়াবে।

রমণী না তাড়াক, বেলা নিশ্চয় ঝাঁটা মেরে দুয়ার থেকে তাদের বিদায় করে দেবে।

এ যুক্তি না মেনে পারে নি অবনী। তবু তার কথা মেনে নিয়েও ঝগড়া করেছিল।

কারণ যুক্তি তো সে চায় না। সে উপায় চায়, রেহাই চায়, বাঁচতে চায়।

লাথি মারুক, ঝাঁটা মারুক, সব সয়ে সে মায়ের পেটের ভায়ের বাড়ী দু'চারটা মাস মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে রাজী। কোনদিকে আর সে কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

এ চিঠি হাতে পড়লে অবনীকে আর ঠেকানো যাবে না।

তার গয়না বেচতে যেতে হয়েছে এটা দুর্ভাগ্য কিন্তু ভাগ্যে সে

পিয়নের চিঠি বিলি করার সময়েই বাইরে গিয়েছে। ভাগ্যে চিঠিখানা হাতে পেয়েছে সে।

অবনীকে এ চিঠি সে দেখাবে না। যে আত্মহত্যা করতে ব্যাকুল তাকে সে উস্কানি দেবে না।

অন্তরের ঝাঁজে কান দুটি ঝাঁ ঝাঁ করে তমালের।

বোঝা।

তার গয়না বেচে বেচে সংসার চালাচ্ছে, তবু সে-ই হয়েছে অবনীর বোঝা!

দু'টো পয়সা রোজগার করার কোন উপায় যদি তার থাকত!

এই জ্বালা আর আপশোষ তার চিন্তাকে ধীরে ধীরে অন্যভাবে জারিয়ে আনে।

তার রোজগারের উপায়?

যোয়ান-মদ্দ শিক্ষিত রোজগেরে মানুষটা কোণঠাসা নিরুপায় হয়ে রোজগারের ফিকিরে ঘুরছে আট ন' মাস—বোকা হাবা ঘরের কোণার বৌ সে—তার রোজগারের উপায়!

কচি কচি দুটো ছেলেমেয়ের মা সে, তার রোজগারের উপায়!

শীর্ণ অপুষ্ট খোকন আর খুকুমণির লাবণ্যহীন করুণ মুখ দু'খানির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না তমাল।

ওদের জন্য কিছুই করার ক্ষমতা তার নেই।

হিন্দুস্থানী এক গোয়ালা বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল দুধের বালতি হাতে করে, তার কাছ থেকে ধারে এক পোয়া দুধ কিনে সে আজ ওদের খাইয়েছে। গম্ভীর মুখে দুধ নিয়ে বলেছে, বাবুকা পাশ দাম পাবে।

ঠিক হ্যায়।

ঠিক যে কিছুই নেই ও গোয়ালা তো তা জানে না। ভেবেছে, বৌ

পোষে, কাজেই বাবু নিশ্চয় মস্ত বাবু না হলেও অনায়াসে এক পো' দুধের দাম শোধ করার মত বাবু নিশ্চয়!

এটুকুর বেশী তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

আজ যেন প্রথম সে বোধ করে নিজের অসহায়তা আর অক্ষমতা। আজই প্রথম যেন তার হঠাৎ খেয়াল হয় যে ছাঁটাই হলেও অবনীই একা তাদের আট ন'মাস খাইয়ে এসেছে, উপোস করতে দেয় নি। তার গয়না বেচেছে এবার নিয়ে কয়েক বার—কিন্তু স্বামীরা স্ত্রীর গয়না তো মদ আর রেসের খরচেও উড়িয়ে দেয়।

সে এতটুকু সাহায্য করে নি অবনীকে!

অবনী পড়েছে বিপাকে অথচ সে চেয়েছে অবনীকে তার নিজের খুশীমত চালাতে। আশ্রয়ের জন্য আবার বেলার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ানো তার কাছে মরার বাড়া অপমান বলে হয়তো তাদের বাঁচাবার জন্য অবনীর ঠিক করা একমাত্র উপায়টাই সে বাতিল করে দিতে চায়। নিজেও মরতে চায়—অবনী আর ছেলেমেয়ে দুটোকেও মারতে চায়।

ভাবতে ভাবতে কত তাড়াতাড়িই যে মনের ভাব একেবারেই বদলে যায় তমালের!

খানিক আগেও সে ভাবছিল ভাগ্যে অবনী বেরিয়েছিল, ভাগ্যে পিয়ন তার হাতে চিঠিটা দিয়েছে—এই ভাগ্যটাকেই বাতিল করার জন্য তমাল যেন উন্মুখ উৎসুক হয়ে থাকে।

অবনী গয়না বেচে বাজার করে বাড়ী ফেরামাত্র তার হাতে রমণীর পোষ্টকার্ডটা তুলে দেয়।

তার গয়না বেচা পয়সায় অবনী পোয়াটেক মাছ কিনে এনেছে, সেদিকে পর্য্যন্ত তার নজর যায় না।

পনের দিন পরে তারা আজ মাছ খাবে!

অবনী চিঠিটা পড়ে। পড়ে' ছেঁড়া পাঞ্জাবীর পকেটে গুঁজে রেখে দেয়। সারাদিন এবিষয়ে সে কোন কথাই বলে না।

তার গয়নাটা এবার বেচেই দিয়েছে অবনী। সেই টাকায় সে আজ এনেছে ভাল মাছ আর তরকারী, সারা হপ্তার রেশন।

অন্য কথা অনেক বলেছে। আসল কথা পকেটে রেখে দিয়েছে।

বেশ। তাই ভাল। চতুর্থ দফায় তার গয়না বিক্রী করে সামলে নিয়ে তাকেই যদি বাতিল করতে চায় অবনী,—করুক!

রাত্রে শুতে যাবার সময় তাকে ডেকে বুকে নিয়ে আদর করে অবনী।

করুক!

তারপর অবনী বলে, শোন, দাদার চিঠির মানে বুঝেছে?

আমি কি বুঝতে পারি এসব?

নিজের দাদা। গুরুজন। আমি যাই নি, কিন্তু কারো কাছে নিশ্চয় শুনেছে আমার দুরবস্থার কথা। তাই এই চিঠিখানা না লিখে থাকতে পারে নি। ভাই মরে যাবে—বড়ভাই গুরুজন কখনো তা সইতে পারে?

তা হলে কালকেই আমরা ওবাড়ী যাচ্ছি?

না। ক'টাদিন কোনরকমে চালিয়ে মাসকাবারে যাব। মাইনের মোটা টাকাটা হাতে থাকবে, দাদা খুশীই হবেন আমরা গেলে।

অবনীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবার পর আর কিছুই বদলায় না। হঠাৎ কেমন অর্থহীন হয়ে বায় ঝিমানো নিস্তেজ জীবনটা।

দিনের পর দিন চাকরী খুঁজেতে বার হওয়া, এভাবে ওভাবে কিছু খুচরো রোজগারের চেষ্টা করা আর একেবারে অচল হলে তমালের

গয়নায় হাত দেওয়া, যেটুকু না হলে বাঁচাই যায় না সেটুকু ছাড়া সব কিছু প্রয়োজন বাতিল করে দেওয়া—একি জীবন ?

তবু কি যেন একটা ছিল ওইভাবে প্রাণপণ করে কোনরকমে টিঁকে থাকা আর আশা করে দিন কাটানোর মধ্যে, তিতো হলেও একটা স্বাদ ছিল জীবনের—হঠাৎ যেন সেই কটু বিশ্রী স্বাদটুকু পর্যন্ত চলে গিয়ে ভোঁতা অর্থহীন হয়ে গেছে বেঁচে থাকা।

আজ মাসের তেইশ না চব্বিশ তারিখ কে জানে। মাসকাবারের বেশী দেরী নেই।

মাসকাবারে এই অসম্ভব লড়াই শেষ করে তারা গিয়ে উঠবে রমণীর আশ্রয়ে।

বাঁচার লড়াই সেখানেও শেষ হয়ে যাবে না! কিন্তু বেঁচে থাকার মানে যেন ফুরিয়ে গেছে আজ থেকেই।

এখানে থেকে নিজেদের বোঝা নিজেরা বয়ে মরে গেলে তার মধ্যে এতটুকু গৌরব না থাক বাঁচার জন্য লড়াই করতে করতে মরে যাবার মানেটুকু থাকত জীবনের।

অবনী বলে, কেন এও তো লড়াই। দরকার হয়েছে নীচু হয়ে অপমান সইতে যাচ্ছি।

অন্যভাবে নীচু হও না, অপমান সও না? চলো বস্তির একটা সস্তা ঘরে চলে যাই। তুমি কুলি খাটবে, আমি ঝি-গিরি করব।

পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে আনা খবরের কাগজটা থেকে মুখ তুলে অবনী একটু হাসে। বলে, আসলে তোমার কি হয়েছে জানো? বৌদির কাছে কি করে নত হবে ভেবে তোমার দম আটকাচ্ছে। তুমি ঝি-গিরি করতে পারবে, সব কিছু সইতে পারবে—শুধু জায়ের কাছে মান খোয়াতে পারবে না।

ছেঁচকি রাঁধার জন্য কুমড়োর টুকরোটা কুচি কুচি করে কাটতে

কাটতে তমাল বলে, কে জানে। হয়তো তাই হবে। আমার মাথায় ঠিক নেই, কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই তো রাজী হলাম। শেষ-কালে নিজের সস্তা একটু মানের জন্য তোমাদের মারব!

অবনী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, অত ভেবো না। আমরা কি চির-কালের জন্য গলগ্রহ হতে যাচ্ছি? দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। দাদাও এটা বোঝে নইলে নিজে থেকে চিঠি লিখত?

তমাল একটু ভেবে বলে, তুমি কি চিঠি লিখে জানাবে, না নিজে একদিন দেখা করতে যাবে?

আমি কিছুই করব না। দোসরা তারিখে আমরা সবাই মিলে একেবারে গিয়ে উঠব।

খবর না দিয়ে?

অবনী সায় দেয়। বলে, মুখ বুজে থাকো, বুঝলে? কাউকে কিছু জানিয়ে দরকার নেই। বাড়ীওয়ালা টের পেলে কিন্তু হাঙ্গামা করবে—সব মাটি হয়ে যাবে।

তার মানেই তারা চোরের মত পালিয়ে যাবে। এখান থেকে চোরের মত পালিয়ে গিয়ে চোরের মতই আপনজনের বাড়ীতে গিয়ে উঠবে।

এতদিনে জীবনে খাঁটি বিতৃষ্ণা জন্মে যায় তমালের।

দোসরা সকালে সে জিজ্ঞাসা করে, কখন যাবে?

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে।

খাওয়া দাওয়া সেরে যাবে! কতই যেন সমারোহ তাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়ার!

পাশের ঘরের মহিম মাইনে পেয়েছে পয়লা তারিখে। সকালে বাজারে গিয়ে মাসে শেষের দিকের তুলনায় সে যেন সমস্ত বাজারটাই

কিনে এনেছে মনে হয়। আধসের কাটা মাছ এনেছে, দু'বেলাই আজ ওরা মাছ খাবে।

সাতজনে খাবে। তবু তমালের মনে হয়, যেতেই যখন হবে, সকাল বেলা চলে গেলেই ভাল হত। কি রাঁধবে ভেবে চোখে জল আসত না। ছেঁচরামি করে ভাসুরের ঘাড়ে গিয়ে ওঠার বিড়ম্বনায় চোখে যদি জল আসে, খেয়ে গেলেও আসবে না খেয়ে গেলেও আসবে।

তাই, বেলা ন'টা নাগাদ বাড়ীর সামনে ভাড়া গাড়ীটা দাঁড়াতে দেখে এবং সেই গাড়ী থেকে রমণী ও বেলাদের নামতে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তাকে ভাবতে হয়, ভাগ্যে সকাল বেলাই তারা বেরিয়ে পড়ে নি।

মাথা ঘুরে গেছে তমালের। চিঠির জবাব না পেয়ে রমণী সপরিবারে তাদের মান ভাঙ্গাতে এসেছে! অবনীর অনুমান যদি সত্য হয়, রমণী যদি জেনে থাকে তাদের চরম দুরবস্থার কথা, হয় তো তা হলে তাদের নিয়ে যেতেই এসেছে।

কিন্তু কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে ওদের সকলের?

কিরকম সসঙ্কোচে স্খলিত পদে বাড়ীতে ঢুকছে?

রমণীর হাতে ছিল একটা সুটকেশ, ছেলেমেয়েদের হাতে তিনটি ভর্তি থলি। সেগুলি বারান্দায় নামিয়ে রেখে তারা ঘরে ঢোকে।

অবনী রমণীকে বলে—দাদা বসুন।

তমাল বেলাকে বলে, বসুন দিদি।

তারা চৌকিতে বসে। দেহে যেন প্রাণ নেই এমনি ভাবে বসে। ছেলেমেয়েরা মাদুরে বসে আড়ষ্টভাবে।

আড়ষ্টতা তমালদেরও এসেছে। ভাই-এর দুরবস্থার খবর জেনে নিজেরাই তাদের নিতে এসেছে—এই আশার ঝলক প্রায় মিলিয়ে

গিয়েছে। তাদের অবস্থা জানলে এভাবে সবাই মিলে কি আর তাদের নিতে আসত!

রমণী বলে, আমরা—

এটুকু বলেই থেমে যায়।

অবনী বলে, তাই ভাবছিলাম। এমন হঠাৎ—?

রমণী হঠাৎ মুখ তুলে বলে, তোমার কাছে কিছুদিন থাকতে এসেছি। একবছর চাকরী নেই, অসুখে ভুগছি, দিন আর চলে না, তাই—

নতমুখী বেলার দিকে চেয়ে তমাল হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না!

পাশ ফেল

খবরের কাগজে খবরর বেরিয়েছে যে একটি ছেলে আত্মহত্যা করার জন্য বিষ খেয়েছিল, এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছে। ছেলেটি আই, এ পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরে সে বিষ খায়।

নীরেন আর বিমল একসঙ্গে পরীক্ষার ফল জানতে যায়। এক কলেজ থেকে পরীক্ষা না দিলেও দু'জনে তারা এক পাড়াতে থাকে। ম্যাট্রিক তারা দিয়েছিল এক স্কুল থেকেই, এক কলেজে দু'জনে সীট পায় নি।

পাশের কৃতিত্বে অনেক তারতম্য ছিল দু'জনের। নীরেন খুব ভাল-ভাবে পাশ করেছিল। বিমলের ফলটা সেরকম হয় নি।

এবার কি হয়েছে কে জানে! যে রেটে ছাত্রদের ফেল করিয়েছে ভাগ্যবিধাতারা! পাশের পার্সেণ্টেজের খবর শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল নীরেনেরও।

কে জানে এই জন্যেই এবার প্রাণেশ একটু দমে গিয়েছে কিনা, যে রকম আগ্রহ নিয়ে উদগ্রীব হয়ে ছেলের সঙ্গে ম্যাটিকের রেজাল্ট জানতে ছুটেছিল, এবার আর তার সেরকম কোন লক্ষণ দেখা যায় নি।

একটু আশ্চর্য্যই হয়ে গিয়েছে নীরেন। বাপ যে কি ভাবে তাকে দু'বছর কলেজে পড়িয়েছে, পরীক্ষার খরচ জুগিয়েছে, সেটা তার অজানা নয়। মা'র গয়না বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে পড়িয়ে পাশ করাবার জন্য।

অথচ এবার যেন পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্য তেমন ব্যাকুলতা তার নেই। আগ্রহ আর উৎকণ্ঠার অবশ্য অভাব নেই, ছেলের পাশ ফেলের খবর জানা সম্পর্কে তার পক্ষে উদাসীন হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু কেমন যেন স্তিমিত, নিস্তেজ ভাব।

শুধু প্রাণেশের নয়। বাড়ীর সকলেরই ব্যাকুলতা যেন এবার অনেক কম। একটু চিন্তিত গম্ভীর ভাব সকলের।

বিমল বলে, পাশের পার্সেণ্টেজ জেনে ভড়কে গেছে। এত ছেলে কচু-কাটা হয়েছে, তুই যদি না বাদ গিয়ে থাকিস! আমাদের বাড়ীতে তো ধরেই রেখেছে আমি এবার নির্ঘাৎ কূপোকাৎ।

তুই আবার যা অসুখে ভুগলি।

বিমলের ফেল করার সম্ভাবনার কথা ভেবে নীরেন এবার বেশ একটু ভড়কে যায়। এতক্ষণ এদিকটা তার খেয়াল হয় নি। বিমলের সঙ্গে আসা তার উচিত হয়নি। যে রকম অল্প ছেলে এবার পাশ করেছে, তাতে বিমলের এবার সত্যই পাশ করার আশা কম। যদি দেখা যায় সে পাশ করেছে আর ও পারে নি, একসঙ্গে বাড়ী ফিরতে কি বিশ্রী লাগবে দু'জনেরই!

নিজের পাশের খবর জেনেও খুশী হবার উপায় থাকবে না।

দেখা যায় অনুমান তার মিথ্যা হয় নি। সে পাশ করেছে, বিমল করেছে ফেল।

মুখখানা ম্লান করে রাখতে হয় বিমলকে। আরও অনেকে যারা রেজাল্ট জানতে এসেছিল, ছাত্রছাত্রী এবং তাদের আত্মীয় বন্ধু, তাদেরও কারো মুখে যেন উল্লাসের ছাপ পড়েনি। নীরেনের মত যে কজন সু-খবর জেনেছে তাদের সকলের সঙ্গেই যে বিমলের মত ফেল করা বন্ধু আছে তা নয় কিন্তু এত বেশী মুখে ক্ষোভ ও বেদনা ফুটেছে যে দু'চারটি মুখের আনন্দের জ্যোতি হারিয়ে গেছে তার আড়ালে। পাশ যারা

করেছে তারাও এত ফেল করা ছেলেমেয়ের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছে বৈকি!

বিমল একটু হাসে। হাসি তো নয়, যেন প্রাণের জ্বালার একটা ঝলক।

বাস্। ষ্টুডেণ্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।

আরেকবার—?

ক্ষেপেছিস? এমন জানলে কলেজেই ভর্তি হতাম না। পড়ার নামে দু'বছর সকলের রক্ত শুষেছি। কেউ বাদ যায় নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে। বাচ্চা বোনটা তো মরেই গেল। আমার কলেজে পড়ার চাপ না থাকলে মরত না, নিশ্চয় মরত না।

নীরেন ভয় পেয়ে যায়। যা ভেবেছিল ঠিক তাই হল। বন্ধুর বিরাট ও বিকট ব্যর্থতার আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় প্রথম ধাক্কাটা এখন তাকেই সামলাতে হবে।

সে কাতরভাবে বলে, এতটা বাড়াস নে ভাই, এত ছেলে তো ফেল করেছে। একবার ফেল করলে কি হয়?

পড়াশোনা জন্মের মত খতম হয়। দুটো বছর সকলের আর নিজের প্রাণপাত কষ্ট মাঠে মারা যায়। পাশ করলে পড়তাম। কোনদিকে তাকাতাম না। রাত্রে বাবা ঘুমোন কিনা, মা'র হার্ট ক্ষয় হচ্ছে কিনা, ভাইবোনেরা খেতে পরতে পাচ্ছে কিনা, কিচ্ছু চেয়ে দেখতাম না। কিন্তু এত করেও যখন ফেল করেছি, এ তামাসার মধ্যে আমি আর নেই।

বিমলদের বাড়ীটা আগে পড়ে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে বিমল বলে, মরি বাঁচি করে বাবা আরেকটা চান্স আমায় দেবেন। নিজেই হয় তো বলবেন, এত টাকা গেল সময় গেল এনার্জ্জি গেল, আরেকটা

বছর চেষ্টা করেই ত্মাখো, নইলে তো সবটাই লোকসান। কিন্তু আমি আর পড়ছি না। এ জুয়াখেলায় চান্স নিতে আমি রাজি নই।

নীরেন চুপ করে থাকে। অস্বস্তি বোধ করতে করতে এতক্ষণে তার মনে হতে থাকে যে পাশ করে সে যেন সত্যই নৈতিক আর সামাজিক একটা অপরাধ করে বসেছে। মানুষের জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলার জুয়া আর জুয়াচুরিতে জিতে গেছে।

বাড়ীর সামনে এসে বিমল বলে, একমিনিটের জন্য আয়। খবরটা জানিয়ে যা।

না ভাই। আজ নয়।

কিন্তু বিমল এক রকম জোর করেই নীরেনকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে যায়। সাগুর স্যসপ্যান উনুন থেকে নামিয়ে রান্নাঘর থেকে বিমলের মা, আদ্ধেক সাবান মাখা ছেঁড়া ভিজা শাড়িটা তাড়াতাড়ি শতজীর্ণ ভিজা সেমিজটার উপরে জড়িয়ে ফাঁকা কলাতলা থেকে বিমলের সতের মাস বয়সে বড় অবিবাহিতা দিদি এবং এদিক ওদিক থেকে বিমলের ভাইবোন আর বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটেদের ছ'চারজন মেয়ে পুরুষ এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়।

বিমল বলে, আমি ফেল করেছি মা। নীরেন পাশ করেছে।

ভূপেন তিনদিন জ্বরে শয্যাগত ছিল। সে ছেলের গলার আওয়াজটাই শুনতে পেয়েছিল, কথা বুঝতে পারে নি।

চেঁচিয়ে বলে, বিমল ফিরেছে নাকি? ফেল করেছে তো?

বিমলের সতর মাস বয়সের বড দিদি, বিমলের কলেজে পড়ার খরচ যোগাবার অজুহাতে যার বিয়ে স্থগিত রেখে আসা হয়েছে এ পর্য্যন্ত, সে নীরেনকে বলে, তুমি পাশ করেছো? আমাদের খুশীর সীম রইলো না। খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখলাম। বিমলটা ফেল করেছে তাতে—

ঘরের ভিতর থেকে ভুপেন জ্বরাক্রান্ত রুগ্ন ক্ষীণ শরীরের সবটুকু জোর খাটিয়ে আবার চেঁচিয়ে বলে, বিমল ফিরে এসেছে না? ফেল করেছে তো?

বিমলের মা তাকে খবর জানাতে ভিতরে যায়। ফেল-করা অভিমানী ছেলের সঙ্গে যেন বুঝে শুনে কথা বলে, এবিষয়ে তাকে সাবধান করে দিতে যায়।

বিমলের দিদি নীরেনকে বলে, বিমলটা ফেল করেছে তাতে আর কি হয়েছে বলো? অমন ঘরে ঘরেই তো ফেল করেছে। ফেলটাই যখন বেশীর ভাগ ছেলে করেছে তখন ফেল করাতে লজ্জার কি আছে! তুমি বরং বাড়ী চলে যাও। সবাই তোমার পাশের খবর জানতে উতলা হয়ে আছে। মাসীমাকে বলো যেন মিষ্টি আনিয়ে রাখেন।

বিমল বলে, আমায় সান্ত্বনা দিতে পাশ ফেল সব সমান করে দিলি যে দিদি!

না, সমান কখনো হয়? বলছি আজকাল ফেল করাটাও দোষ নয়, লজ্জারও নয়।

বিমলের মা বলে, না পারলে উপায় কি।

এ বাড়ীর অন্য ঘরের ভাড়াটে কমল বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে বিমলের দিদির খুব ভাব আছে, সে সমর্থনের সুরে বলে, তা নয়তো কি? আমার ভাই আর ভাগ্নে দুজনে ফেল করেছে!

সকলে সহজ করে দিতে চায় বিমলের ব্যর্থতার ক্ষোভ, মুছে নিতে চায় তার প্রাণের জ্বালা। তার মধ্যেই ফুটে বেরোয় সকলের ভয় আর উদ্বেগ। বিমল চিরদিন বড় অভিমানী ছেলে, চিরদিন একরোখা। ফেল করার প্রতিক্রিয়ায় সে এখন কি করে বসে এটাই দাঁড়িয়েছে সকলের সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা।

আরেকবার আরও জোরের সঙ্গে নিজেকে অপরাধী মনে হয়

নীরেনের। একজনেরও এ পরীক্ষায় পাশ করা উচিত হয়নি। সামান্ত কিছু ছেলে পাশ করেছে বলেই না বিমলের মত গাদা গাদা ছেলের ফেল করাটা দাঁড়িয়েছে ফেল করায়!

টলতে টলতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ভূপেন দরজা ধরে দাঁড়ায়। নীরেনকে সে চোখেও দেখতে পায় না—সে পরের ছেলে, যদিও প্রাণেশ তার অনেক দিনের বন্ধু এবং নীরেন সেই বন্ধুরই ছেলে ।

সকলে মুখের দিকে তাকায়, কেউ কিছু বলার আগেই শান্ত গম্ভীর গলায় বিমলের বাবা বলে, বিমল ফেল করেছিস তো? বেশ করেছিস!

বৈঠকখানা বলে কিছু নেই। বাইরের সরু রোয়াকে দাঁড়িয়ে প্রাণেশ একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল। তারই আপিসের সুজন বাবু।

তাকে দেখে নীরেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়। প্রাণেশ যে আপিস যায় নি তার মানে বোঝা কঠিন নয়, ছেলের পরীক্ষার খবরটা সদ্য সদ্য জানার জন্য একটা দিন আপিস কামাই করছে। কিন্তু সুজনও আপিস কামাই করে তার বাবার সঙ্গে গল্প জুড়েছে কেন?

সুজন প্রশ্ন করে, কি খবর হে?

একা বাড়ীর কাছে এসে এতক্ষণে নীরেন মুখে একটু হাসিখুশী ভাব আনতে পেরেছিল পাশ করার আনন্দের স্বাদ পাচ্ছিল। সুজনের প্রশ্নে তার মুখ হাসিতে ভরে যায়।

পাশ করেছি।

কিরকম পাশ করেছে শুনে নিয়ে সুজন বলে, বাঃ! বাহাদুর ছেলে! এই ফেলের বাজারে এত ভালভাবে পাশ করা তো সোজা ব্যাপার নয়!

প্রশংসার লজ্জায় বিমল মাথা নামায়। এতক্ষণে সে প্রথম অনুভব

করতে পেরেছে পরীক্ষা পাশের রোমাঞ্চ—দুটি বছর গরীবের ছেলের প্রাণপাত কষ্ট করে সফল হওয়ার উত্তেজক সুখ।

বিমল ফেল করে শুধু তাকে দমিয়ে রাখেনি এতক্ষণ, কেমন হতাশায় প্রাণ ভরে দিয়েছিল।

আশা আর স্বপ্নে আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ।

কিন্তু প্রাণেশ কিছু বলে না কেন? প্রাণের হাসি ও গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না কেন?

বিমল পাশ করতে পারে নি বাবা।

প্রাণেশ আপশোষ করে না, সংক্ষেপে বলে, পারে নি? পাশ করেই বা কি করত।

বাপের মন্তব্য শুনে নীরেন থ' বনে যায়। যে ছেলে সদ্য সদ্য ভালভাবে পরীক্ষা পাশের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে তাকে এমন কথা শোনানো! বিমলের ফেল করা আর ছেলের পাশ করা ব্যাপারটারই যেন বিশেষ কোন মূল্য নেই প্রাণেশের কাছে।

অথচ তাকে পাশ করানোর জন্য সে গায়ের রক্ত জল করেছে।

সুজনের কাছে পেলেও বাপের কাছে ঠিকমত অভিনন্দন না পেয়ে নীরেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই ভিতরে যায়। সেখানে অবশ্য তার অভ্যর্থনা জোটে দিগ্‌বিজয়ীর মতই—ছোট ভাইবোনদের কাছে।

সকলে তারা হৈ হৈ চেঁচামিচি সুরু করে দেয়। তের বছরের বোন রেখা উঠানে গিয়ে চেঁচিয়ে উপর তলায় খবর পাঠিয়ে দেয়, বকুলদি! ও বকুলদি! দাদা পাশ করেছে!

এক মিনিটের মধ্যে উপরতলার ভাড়াটে দীনেশের মেয়ে বকুল নেমে আসে। এবার সে ম্যাট্রিক দিয়েছে।

হাসিমুখে হাতটা নীরেনের দিকে বাড়িয়ে বলে, ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উৎরে যাই।

মা এতক্ষণ কথা বলে নি! তার মুখের হাসি আর চোখের গর্বভরা চাউনিতেই নীরেনের প্রাণ ভরে গিয়েছিল। তবু সে অনুযোগ দিয়ে বলে, তুমি তো কিছু বললে না মা ?

কি আবার বলব ? আমি জানতাম তুই পাশ করবি। আমার গয়না ধার নিয়েছিস, পাশ করে শোধ দিবি না !

সকলের সামনে তার গয়না বিক্রীর কথা বলায় নীরেন ক্ষুব্ধ হয়। সত্য সত্যই একদিন সে কি শোধ দেবে না মায়ের গয়না, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারলে মায়ের সুখের ব্যবস্থা করবে না সকলের আগে ? আজকের বিশেষ দিনটিতেও গয়না দিতে হওয়ার কথাটা মা পর্য্যন্ত ভুলতে পারে না।

যেটুকু আনন্দ আর উত্তেজনা জেগেছিল বাড়ীতে তার পাশ করার খবরে, এত কষ্টে তাকে পাশ করানোর জন্যে, কত তাড়াতাড়িই সেটা ঝিমিয়ে নিস্তেজ হযে এসে একেবারে ফুরিয়ে যায় ! নীরেন ভেবেছিল, প্রাণেশ ভেতরে এলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এক চোট জল্পনা কল্পনা চলবে। কিন্তু প্রাণেশ ঘরে এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে, ছেলের সম্পর্কে তার কথা বলবার কোন উৎসাহই আর দেখা যায় না।

তার মা বলে, সুজনবাবু কি বলল ? মাইনে বাড়িয়ে দেবে ?

প্রাণেশ বলে, আজ তো শুধু টোকেন ষ্ট্রাইক হল। এরপর কি হয় দেখা যাক।

তাই বটে ! পাশফেলের চিন্তায় মসগুল হয়ে থেকে নীরেন ভুলেই গিয়েছিল যে তার রেজাল্ট জানার আগ্রহে প্রাণেশ আপিস কামাই করে নি, আজ তাদের আপিসে ষ্ট্রাইক।

· কিন্তু তাই বলে তার বিষয় কথা বলা কি বারণ ? আজও শুধু দেনা আর সংসারের অভাব অনটনের কথাই হবে দু'জনের মধ্যে? রেখা আজ

সকালেও কান্নাকাটি করেছে, তার একটাও আস্ত জামা নেই। মুদী দোকানে কিছু টাকা না দিলে এবার হয় তো গলায় গামছা দিয়ে অপমান করবে, মাসকাবারে একটা পাঞ্জাবী না করলে আর আপিস করা সম্ভব হবে না প্রাণেশের—আজও চলবে চিরদিনের এই একই কথার পুনরাবৃত্তি?

নীরেন নিজেই বলে, জানো, বাড়ীতে একটু হেল্প্ পেলে আমি হয় তো প্লেস বাগাতে পারতাম। নিজে নিজে পড়ে হয় না।

প্রাণেশ আর নীরেনের মা কথা বন্ধ করে এক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দু'জনেই নিঃশ্বাস ফেলে একসঙ্গে।

অভিমান পাক দিয়ে ওঠে নীরেনের মধ্যে। এদের যখন আগ্রহ নেই, থাক। যার আগ্রহ আছে তার সঙ্গেই আলোচনা করা যাক আজ পাশ করার মধ্যে তার কোন্ ভবিষ্যৎ সূচিত হল।

উপরে গিয়ে সে বকুলের সঙ্গে কথা বলে। বকুল সাগ্রহে তার কথা শোনে। বি, এ-তে সে আরও ভাল রেজাল্ট করবে। এবার আরেকটু শক্ত হবে, লোককে বুঝিয়ে দেবে যে উঁচুদিকের পরীক্ষায় কোন ছেলে যদি ভাল্ রেজাল্ট করতে চায় সংসারের দশটা বাজে কাজের ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপলে চলে না।

বকুল বলে, সত্যি।

বিকালে নীরেন পাড়ার চেনা লোকের বাড়ীতে যায়। যে বাড়ী থেকে কেউ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে সে বাড়ী বাদ দিয়ে। পরের দিনটা আত্মীয়স্বজনের বাড়ী ঘুরে কাটিয়ে দেয়। বাড়ীতে যে উদাসীনতা তাকে ব্যথিত করেছিল, সেটা কেটে যায় বাইরের মানুষের সাদর অভিনন্দনে।

ট্রাম-বাসের খরচের জন্য একটা টাকা চাওয়ায় প্রাণেশ যে কড়া

কথাটা বলেছিল তার দুঃখও তলিয়ে যায় দশ জনের প্রশংসা শুনে এবং দশজনকে নিজের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শুনিয়ে।

দিন তিনেক পরে প্রাণেশ তাকে বলে, তুমি বড়ো হয়েছো, সংসারের কথাটাও এবার তোমার একটু ভাবতে হয়। কি দিনকাল পড়েছে বুঝতেই পার।

এটা কিসের ভূমিকা বুঝতে না পেরে নীরেন চুপ করে থাকে।

প্রাণেশ বলে, বিমল চাকরীর চেষ্টা করছে। তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, নইলে আর চলে না।

আর পড়াবে না আমায়?—আর্তনাদের মত শোনায় নীরেনের কথাটা।

কোত্থেকে পড়াব? আই, এ পড়াতেই দেনা করেছি, তোমার মায়ের গয়না বেচেছি। বি, এ পড়াবার ক্ষমতা কি আছে আমার?

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয় নীরেনের। জগৎ হয়ে যায় অন্ধকার, ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে যায় অর্থহীন।

ঘরের কোনে তার পড়ার টেবিলটির সামনে চুপচাপ বসে সে কাটিয়ে দেয়।

বিকেলে বুকুল এসে সব শুনে বলে, সর্ব্বনাশ। তবে কি হবে?

তার প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন রাত্রে নীরেন বিষ খায়।

নীরেনের আত্মহত্যার জন্য বিষ খেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার খবরটাই খবরের কাগজে বেরিয়েছে। পরীক্ষার ফল বার হবার তিনদিন পরে যে সে বিষ খায় তারও উল্লেখ আছে খবরে। কিন্তু নীরেন যে ফেল করে নি, পরীক্ষায় খুব ভালভাবে পাশ করেছিল—এটা খবরে লেখা ছিল না!

কলহান্তরিত

একটা মেয়েলি কলহের পরিণামে এমন সংকট সৃষ্টি হতে পারে? তিনশ লোকের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা ভেস্তে যেতে বসে? এ যেন কল্পনা করা যায় না।

তিনশ মানুষ আজ কতকাল ভাগ হয়ে কাছে তিন ভাগে, তিনটি ইউনিয়নে। এত কাল পরে যদিও বা দেখা দিয়েছে তিনটে ইউনিয়ন একটা হয়ে যাবার সম্ভাবনা, দু'জন স্ত্রীলোকের ঝগড়া আবার সব নষ্ট করে দিতে বসেছে।

গোকুলের সাথীরা হাসবে না কাঁদবে ভেবে না পেয়ে শুধু বলে, কী আপশোষ! কী আপশোষ!

মালিকপক্ষ আর দীনেশেরা কয়েকজন হাঁফ ছেড়ে বলে, বাঁচা গেল। লাগ বাবা রাবণ বিভীষণ, আরও জোরসে লাগ!

গোকুলদের এবং দীনেশদের ইউনিয়ন দুটি বেসরকারী। এ দুটি ইউনিয়নের জন্যই অবশ্য সম্ভব হয়েছে এবং টিঁকে আছে মালিক পক্ষের নিয়ন্ত্রিত আইন-সম্মত তৃতীয় ইউনিয়নটি। সকলেই জানে যে বেসরকারী ইউনিয়ন দুটি কোনরকমে মিলে গেলেই ইউনিয়ন দাঁড়িয়ে যায় একটা—কর্তাদের গড়া লোক দেখানো ফাঁকির বদলে কর্মীদের নিজেদের আইন-সম্মত ইউনিয়ন।

দীনেশ মিল চাইত কিন্তু মিলতে রাজী হত না। সে বলত, বেশ তো, তোমাদের ইউনিয়নটা ভেঙ্গে দাও। আমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়।

কিন্তু এতো জানাই আছে যে এটা বাজে কথা। এভাবে ত্রিভুজ ভেঙ্গে সরল রেখা করা গেলে অবশ্য গোকুলদের কোন আপত্তি ছিল না। দীনেশরা ইউনিয়ন চালাবে মানেই সেটা হবে কর্তাদেরই বশম্বদ ইউনিয়ন, এখনকার মত সোজাসুজি আইন সম্মত ইউনিয়নটা দখল করে থাকার বদলে ওভাবে বশে রাখতে পেলে কর্তারা খুশীই হবে।

তবু, তাতেও আপত্তি ছিল না, কর্মীরা যদি একসাথে দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করার সুযোগ পেত। যতই পিছিয়ে থাক সেরকম অচেতন তো আর নয় মানুষগুলি আজ।

কিন্তু সে সুযোগ জুটবে না।

তেমন দেখলে দীনেশরা ফাটল ধরিয়ে দেবে, আরেকটা বেসরকারী ইউনিয়ন গড়ে আসল ইউনিয়ন ফিরিয়ে দেবে কর্তাদের দখলে।

সার হবে শুধু গোকুলদের ইউনিয়নটা ভেঙ্গে দেওয়া! দীনেশ কাঁচা পাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মুচকে হেসে হরেনকে বলত, গোকুল শালারা বোঝে ছাই। এ দেশটা কি সোভিয়েট হয়ে গেছে, খাওয়াপরার ভাবনা নেই? এ দেশে যে করে খেতে হবে ব্যাটারা তাই ভুলে মেরে দিয়েছে। তুই নিজে যদি না-ই বাঁচলি তোর বাপের নাম কিসে থাকে রে বাবা!

হরেন যোয়ান মানুষ, একটু গম্ভীর আর বড়ই মেজাজী। সব কথায় সায় দিতে পারত না, মুচকি হাসিতেও নয়। গভীর আপশোষের সঙ্গে বলত, সত্যি, বড় অভাগা দেশটা।

তার মানে দীনেশ বুঝত অন্যরকম।

একটু গোঁয়ার একটু ভোঁতা কিন্তু সাদাসিধে সরল মানুষটা। ঘোরপ্যাঁচ সে তলিয়ে বুঝত না, মাথাও ঘামাত না। ইউনিয়নের প্রতি তার সহজ আনুগত্য ছিল মস্ত বড় অবলম্বন।

নিজের মত করে বললেও সে প্রায় দীনেশের কথারই প্রতিধ্বনির মত বলত, ইস্! আমাদের ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেব—অত খায় না! আরও জোরদার করব আমাদের ইউনিয়ন, পরেশ বাবুদের হটিয়ে দিয়ে আমরা মেজরিটি হব।

দীনেশ বলত, তা না তো কি? তুমি আমি আছি কি করতে?

দীনেশ পাকা ঝাণু লোক, কাজের লোক—কিন্তু শুধু তাই দিয়েই কি লাগাম ধরে রাখা যায় আজকালকার দিনে। হরেনকে সকলে বিশ্বাস করে ভালবাসে। সে নিজেও জানে না ইউনিয়নে তার কতখানি প্রভাব, তার কথাকে সকলে কতটা মূল্য দেয়।

দীনেশ ভাবে, ভাগ্যে জানে না!

ভাগ্যের কথা কিনা তাই ভয়ও বেশি। গোকুলের সঙ্গে হরেনকে অনেকক্ষণ কথা কইতে দেখে আতঙ্ক হয়!

—ওর সাথে তোমার অত গুজগাজ কিসের?

—একটা ঘর খালি আছে বলছিল। ঘর বদলাও ঘর বদলাও করে বৌটা পাগল করে দিলে দীনেশদা।

—ঘর? আমি তোমায় ভাল ঘর খুঁজে দেব।

কিন্তু সেজন্য কে বসে থাকবে? ঘর একটা খালি হয়েছে, নগদ নগদ দখল করাই ভাল। তার তো আর নিজের জন্য গোকুলের সঙ্গকে ভয় করার কারণ নেই দীনেশের মত যে ঘরের খবরটা গোকুল দিয়েছে বলে আর ও বাড়ীতে গোকুলও আরেকটা ঘরে থাকে বলে সুযোগটা বাতিল করে দেবে।

রত্না কেবল বলে, তুমি তো বাইরে দিন কাটাও, দম আটকে আমি যে মরলাম?

শুধু ছোট নয়, সেঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর, অন্য ঘরে আরসোলা

তাড়ালে এই 'ঘরের কোণে এসে আশ্রয় নেয়। দু'বেলা পৃথিবীর সব উনুন আর চিমিনির ধোঁয়া যেন এই ঘরে ঢুকতে ভালবাসে!

সস্তা ছিল। ভাল ঘরে টাকা বেশি লাগবে। কিন্তু উপায় কি? মাসে দু'চার দিন যে মাছ খেত সেটা নয় বাদ যাবে। আরও দু'চারটা প্রয়োজন নয় ছাঁটাই হবে জীবন থেকে।

এক বাড়ীতে কাছাকাছি দু'খানা ঘরে গোকুল আর হরেনের ভাব হতে সময় লাগে। গোকুল তাকে কথা বলে বাগিয়ে নেবে এ ভয় কিছুমাত্র না থাকলেও গোকুল যে বিরোধী ইউনিয়নের লোক, এটা হরেন ভুলতে পারে না।

বাড়ির অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে সে আলাপ করে, দু'একটা গা-ছাড়া কথা বলে সে গোকুলকে এড়িয়ে যায়। তার সঙ্গে ঘনিষ্টতা করার চেষ্টা গোকুলেরও কিছু মাত্র দেখা যায় না। হরেনকে সে খাতির করে খালি ঘরখানায় ঢোকায় নি। অন্যের কাছে খবর পেয়ে হরেন শুধু ঘরটা সম্পর্কে তার কাছে খবরাখবর জেনে নিয়েছিল।

দু'পক্ষে তাগিদ থাকে সে আলাদা কথা, কাছাকাছি এসে বাস করছে বলেই নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্টতা গড়ে তোলার সময়ই বা কই মানুষের, সেরকম মনের অবস্থাই বা কই! তাদের মত মানুষের বইবার সাধ্য ছাড়িয়ে অনেক বেশি ভারি হয়ে উঠেছে জীবনযাত্রার বোঝা—খাদ্য বস্ত্র আনন্দ অবসর সব কিছু ছেঁটে প্রায় সাফ করে আনার পরেও! একদিকে এই অসম্ভব বাঁচার লড়াই, অন্যদিকে এমন করে বাঁচার অভিশাপ শেষ করার লড়াই। সময় কই মানুষের?

গোকুলের বৌ রাণীর সঙ্গে রত্নার ভাব কিন্তু জমে ওঠে খুব তাড়াতাড়ি। আবার অল্পদিনেই তাতে ফাটল ধরে যায়।

· রাণীর চেহারা ভাল। গড়নটি তার সেই ধরণের যা চোখ টেনে এনে নিজেকে দেখায়। স্বাস্থ্য ভাল, পেট ভরে না, তাই ভাল তরকারীর

বদলে বেশী করে সস্তা শাক পাতা আর রুটি খেয়ে খেয়ে রোগা হবার বদলে তার দেহে একটা বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটেছে। ভিতরে দুর্বল বোধ করে অথচ দেহটি বেশ সবল এবং পুষ্ট—আসলে যেটা খাঁটি পুষ্টির ধাপ্পা মাত্র—একটু ফেঁপে ওঠা।

রত্না কাঠির মত রোগা। রাণীকে দেখেই মনে মনে সে মুখ বাঁকিয়েছিল।

হরেনকে বলেছিল, কি বেশ্যাটে বেশ্যাটে চেহারা, মাগো!

হরেন বলেছিল, সে কি? বেশ্যারা ওরকম ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে নাকি?

—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাও দেখেছ?

রত্না একটু হিংসুটে আর স্বার্থপর। জীবনে সুখশান্তি স্বচ্ছলতা থাকলে হয় তো স্বভাবের এসব খুঁত চাপা পড়ে থাকত, দুঃখ দুর্দশার চাপ মনটাকে আরও বাঁকিয়ে দিয়েছে। এ তো ত্যাগ নয়, ইঙ্গিত করলে লাখপতিরা ঝুলি ভরে দিতে ছুটে আসবে যে ত্যাগের মাহাত্ম্যে, এ স্রেফ কদর্য বাস্তব দারিদ্র্য। এ দারিদ্র্য হয় মানুষকে বীর লড়ায়ে করে তোলে নয় মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দেয়। দারিদ্র্যই মানুষের সেরা শত্রু।

গরীবের খাঁটি বন্ধুও অনেক সময় ভুল করে দারিদ্র্যকে তুলে ধরে। শোষক ধনী অমানুষ বলেই যেন শোষিত গরীবেরা মানুষ হয় শুধু তারা গরীব বলেই!

কত দরদীই যে ভুলে যায়, লড়াই মনুষ্যত্ব দেয় গরীবকে, তার দারিদ্র্যটা নয়।

অভাব স্বভাবকে নষ্ট করবেই। মানুষের যে সদ্‌গুণ নিছক কুসংস্কার আর ফাঁকি শুধু সেগুলির গোড়া খোঁড়ে না—সেটাতো মঙ্গলের কথাই—মনুষ্যত্বও কুরে কুরে খায়। এটা ঠেকানাও আরেকটা লড়াই গরীবের

রত্না নিজেই ভাব করে। ভাব করতে হয়। শুধু যে একটা কলে জল নেওয়া বাসন মাজা থেকে সব কাজ সারতে হয় দু'জনকে এমন তো নয়, একই ঘুপচির মধ্যে দু'জনকে পাশা পাশি—প্রায় ঘেঁষাঘেষি করে—রাঁধতেও হয়।

দু'খানা ঘরের এটাই রান্নার ঠাঁই। এখানে না পোষায় নিজের ঘরের মধ্যে রান্না কর!

রত্না বলে, তোমার উনানে ভাতটা একটু চাপাই ভাই? তরকারী হবে না, কিছু ভেজে দি চটপট। কাজে যাবে কি খেয়ে?

রাণী বলে, চাপাও।

সে বিরক্ত হয়। তার লোকটাও যে একই সময় একই যায়গাতে কাজে যাবে, এটা রত্নার খেয়াল নেই? শুধু নিজের সুবিধা খোঁজে! কিন্তু তাই বলে ঠিক শোধ নিতে নয়, প্রয়োজন বলেই রাণী তাকে দু'ফালি বেগুণ দিয়ে বলে, তোমার সাথে ভেজে দিও ভাই।

রত্না বিরক্ত হয়। দু'দণ্ড উনানটা চেয়েছে বলে যেন পেয়ে বসেছে! বেগুণ ভাজতে তেল লাগে না?

দু'জনের ভাব একটু গড়ে উঠতে না উঠতে এমনি কত যে খুঁটিনাটি ঘা লাগতে সুরু হয়!

তা হোক, ছোট ছোট বিরোধ নিয়ে সুরু হোক, পরে একদিন ভেঙ্গে পড়বে জানা থাক, তাদের ভাব করা থেকেই গোকুল আর হরেনের মধ্যে দূরত্ব ঘুচে যাবার সূচনা হয়।

যে যার স্বামীর কাছে গল্প করে অপরজনের দোষগুণ মতিগতি আর ঘর সংসারের কথা। শুনতে শুনতে দু'জনেই তারা অনুভব করে যে স্ত্রীরা তাদের খুব ঘনিষ্ট হয়েছে, পরস্পরকে দু'জনকে তারা খুব বেশি পছন্দ করুক আর না করুক!

দেখা হলে ঘর সংসারের ব্যাপার নিয়ে কথা বলার তাগিদও অনুভব করে দু'জনে।

হরেন বলে, জল নিয়ে তো বিষম ব্যাপার হল ! আপনার স্ত্রীরও নাকি মশাই নাইবার জল জোটে নি শুনলাম ?

গোকুল বলে, আর বলেন কেন। কোন্‌টা জুটছে উচিত মত ? এতদিন খেঁচাখেঁচি করে পাঁচটা টাকা আদায় করতে পারলেন ?

এটা সাম্প্রতিক ব্যাপার। ঘটনাটা হরেনকে পীড়ন করছিল। গোকুলেরা অনেক বেশি দাবি তোলে, দীনেশের চেষ্টায় দাবিটা শেষ পর্য্যন্ত সস্তায় রেশনের কাপড় অথবা পাঁচটাকা মাগ্‌গী ভাতা বেশি দেবার দাবিতে দাঁড় করান হয়।

বাইরে রেশনের কাপড় দেওয়া হচ্ছে এই যুক্তিতে যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া হয় দাবিটা।

হরেন বলে, কি করে হবে ? শুধু অমিল আর মিলে মিশে কি করা যায় সে বিষয়ে বড় বড় বুলি কপচানো।

গোকুল মন্তব্য করে, তোমরা মেয়ে মানুষেরও বাড়া বুঝলে ? তোমাদের মত দশা হলে সতীনেও ঝগড়া ভুলে যায়।

হরেন হেসে বলে, আমাদের কোন ঝগড়া নেই।

এমনিভাবে আরম্ভ হয় গোকুল আর হরেনের কথার আদানপ্রদান, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট আর সুনির্দিষ্ট হয়ে আসে তাদের কথা। দু'দিন আগে যে বিষয়ে আলাপ শুরু হলে হয়তো দু'জনে ঝগড়া বেঁধে যেত, দু'দিন পরে সেই বিষয়েই তারা প্রাণ খুলে আলাপ করে।

আলাপ থেকে তর্কও বেধে যায়। বোঝাপাড়ার যে সরু সুতো টানতে গেলেই ছিঁড়ে যেত, নতুন নতুন সুতো জড়িয়ে পাকিয়ে সেটা শক্ত হয় দিন দিন।

—ওই যে পাঁচ টাকা ফস্‌কে গেছে, তোমায় আমায় আদায় করতে পারব ?

—শুধু ওটা ? আরও আদায় করতে পারব।

হরেন ভাবনায় পড়ে যায়, দিন দিন সে যেন রীতিমত ভাবুক হয়ে ওঠে। দেখে বড়ই ঘাবড়ে যায় রত্না। তার কাছে মানুষটা মুখ গোমড়া করে কি যেন ভেবেই চলে শুধু, ওদিকে রাণীর সাথে দিব্যি হেসে কথা কয় !

গা জ্বালা করে রত্নার।

হরেনের মনস্থির করাটা যেন আচমকা ঘটে যায়। হঠাৎ একদিন যেন ঝোঁকের মাথায় সে ঠিক করে ফেলে যে দীনেশকে ছেড়ে গোকুলদের সঙ্গে ভিড়ে যাবে। সকলের জন্য একটা জোরালো ইউনিয়ন গড়ে তোলাই উচিত।

আসলে তার প্রকৃতিটাই এরকম। একগুঁয়ে সোজা মানুষ, একটা কাজ উচিত ভাবলে তাই নিয়ে টাল বাহানা করা একেবারেই তার ধাতে নেই।

দীনেশ প্রায় ক্ষেপে গিয়ে বলে, আগেই বলি নি তোকে ও শালার সাথে অত মিশিস না, তোকে বিগড়ে দেবে, তোর সর্বনাশ করে ছাড়বে।

হরেন চোখ পাকিয়ে বলে, নেশা করেছ নাকি দীনেশদা ? তুই তোকারি সুরু করে দিলে ?

—নিজের পায়ে কুড়ুল মারছ, তাই বলছি। ওদের সাথে ভিড়লে আখেরে মঙ্গল নেই জেনে রেখো। এসব বুদ্ধি ছাড়ো, আমি বরং চেষ্টা করে আরেকটা প্রমোশন বাগিয়ে দিচ্ছি।

—তুমি বড় ইয়ে মানুষ দীনেশদা !

মৌচাকে ঢিল পড়ার মত কর্মীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। উত্তেজিত জটলা আর পরামর্শের অন্ত থাকে না। বহুদিন ধরে মনেপ্রাণে সকলেই যা চেয়ে আসছে, এতদিন পরে এবার কি সম্ভব হবে সেটা?

নিরাশাবাদী বিপিন বলে, আরে ধেৎ! তেলে জলে কখনো মিশ খায়? সব ভেস্তে যাবে দেখিস্।

কিন্তু মুখে হতাশার কথা বললে কি হবে। বিপিনেরও উৎসাহ জেগেছে। সে যেচে গিয়ে হরেনকে বলে আসে, আমি তোমার সাথে আছি ভাই।

ইউনিয়নের সভায় সরাসরি তাদের ইউনিয়ন ভেঙ্গে দিয়ে গোকুলদের ইউনিয়নে যোগ দেবার প্রস্তাবটা দীনেশ ঠেকাতে পারে কিন্তু হরেনের সংশোধিত প্রস্তাবটা ঠেকাবার ক্ষমতা তার হয় না।

সংশোধিত প্রস্তাবে বলা হয় যে তাদের দু'টি বেসরকারী ইউনিয়ন একসাথে পাঁচশো কর্মীর সভা ডেকে নতুন ইউনিয়ন গড়বে যে ইউনিয়ন বর্তমান আইন-সম্মত ইউনিয়নের স্থান দাবী করবে এবং দাবী নিয়ে লড়াই চালাবে।

এ প্রচেষ্টাকে নষ্ট করার অপচেষ্টা যথাসাধ্য চলতে থাকে। সে তো চলবেই। কিছু গড়তে গেলে লড়তে হবেই। ভেঙ্গে দেবার এই প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যদি শেষ পর্যন্ত ভেস্তেও যায় গড়ে তোলার চেষ্টা, সে হবে আলাদা কথা। লড়ায়ে হারজিত আছে।

কিন্তু বিপদ যে এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে! একটা মেয়েলি কোঁদল খাটুয়েদের নিজস্ব নতুন ইউনিয়ন গড়ার আশা নির্মূল করে দিল— দিল একেবারে শেষ মুহূর্তে।

সকাল বেলাই রাঁধতে রাঁধতে প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে গেল রত্না আর

রাণীর মধ্যে—অসাবধানে রাণীর হাতের গরম হাতায় রত্নার গায়ে ছেঁকা লেগে যাবার ফলে।

কুৎসিৎ গালাগালি করেই গায়ের জ্বালা মিটল না রত্নার—তার তো শুধু গরম হাতা থেকে গায়ে একটু ছ্যাঁকা লাগার জ্বালা নয়! পেটের ছেলের বোঝাটাও দিন দিন তার ক্ষীণ দুর্বল শরীরটার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

দিশেহারা হয়ে রাণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আঁচড়ে তার গায়ে রক্ত বার করে দেয়। রাণী ঠেলে না দিলে বোধ হয় কামড়েও দিত।

রাণীরও ভিতরের দুর্বলতা আর অস্থিরতা-বোধ বেড়ে চলেছিল প্রতিদিন। ঠেলাটা সেও একটু দিশেহারা হয়েই দিয়ে বসে।

উনানে ডালের কড়াই-এর উপর পড়ে যায় রত্না, গরম ফুটন্ত ডালে গায়ের অনেকটা যায়গা তার ঝল্‌সে পুড়ে যায়।

তাদের চেঁচামেচি শুনে দু'চারজন ব্যাপার দেখতে এসেছিল, রত্নার আর্তনাদ শুনে আরও কয়েকজন ছুটে আসে। ধরাধরি করে রত্নাকে তারা তার ঘরে নিয়ে যায়।

রাণী ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কোনদিকে তাকাবার বা কি ঘটছে দাঁড়িয়ে দেখবার সাধ্য তার ছিল না। বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানির সঙ্গে মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে জগৎটা অন্ধকার হয়ে আসছিল।

ব্যাপারটা শুধু এ পর্যন্ত গড়ালে ভাবনা ছিল না। কিন্তু বাজার করে ফিরে রত্নার অবস্থা দেখে আর তার মুখে ব্যাপার শুনেই মাথায় যেন আগুন ধরে যায় রগচটা হরেনের। প্রচণ্ড আক্রোশে গোকুলের ঘরে গিয়ে গলা ফাটিয়ে সে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে রাণীকে।

রত্নাকে দেখতে যাবে বলেই রাণী প্রাণপণ চেষ্টায় কোনরকমে

উঠে বসেছিল, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার জোর পায় নি। হঠাৎ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

গোকুল যখন ফিরে এল, ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে। বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা ডাক্তার এনেছিল।

ডাক্তার বিদায় নেওয়া পর্যন্ত গোকুল চুপ করে রইল। তারপর সোজা গিয়ে হরেনের গালে বসিয়ে দিল এক চড়।

—অসভ্য জানোয়ার! মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তুই পুরুষ হয়ে মেয়েছেলেকে মারতে যাস্! তোকে আমি খুন করব।

ঘটনাটা মঙ্গলবারের। সভা ডাকা হয়েছিল শনিবার বিকালে।

কিন্তু আর কি লাভ আছে সভা ডেকে? সমস্ত সম্পর্ক চুকে-বুকে গিয়েছে গোকুল আর হরেনের মধ্যে। আক্রোশে ফুঁসছে দু'জনে। দেখা হলে রাগে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বোঝা যায়, এ ভাঙ্গন আর জোড়া লাগার নয়। হরেনের নাম করলে গোকুল বলে, ও বজ্জাতটার নাম কোরো না আমার কাছে। জানোয়ারটাকে খুন করে আমার ফাঁসি যাওয়া উচিত ছিল।

গোকুলের নাম শুনলে হরেন কটমট করে তাকায়। দাঁতে দাঁত ঘষে একটা অকথ্য শব্দ উচ্চারণ করে।

শুধু বন্ধুত্ব ভেঙ্গে গেলেও কথা ছিল। দু'জনে একেবারে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের!

শনিবার বিকালে মিটিং বসে বটে কিন্তু কারো মধ্যে উৎসাহ জাগে না। দীনেশ শুধু মহোৎসাহে সিগারেট টানে আর তার নিজের লোকেদের সঙ্গে ফিসফাস গুজগাজ পরামর্শ চালায়।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। মুখ তার হাঁ হয়ে যায় এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখে।

গোকুল আর হরেন কথা কইতে কইতে হলে ঢুকছে! বিবাদ কি

ওদের মিটে গেল? দশমিনিট আগেও যারা পরস্পরকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল?

এ কি ম্যাজিক?

মিটিং শেষ হলে উচ্ছ্বসিত আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে গোকুল আর হরেন বাইরে আসে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দু'জনে দু'দিকে সরে যায়।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিপিন হরেনকে বলে, গোকুলকে ডাকো, চা'টা খাওয়া যাক।

হরেণ বলে, ও শালার নাম কোরো না আমার কাছে।

গোকুলও তার বন্ধুকে বলে, ও বজ্জাতটার নাম কোরো না আমার কাছে। ওকে খুন করিনি—আমার এ আপশোষ যাবার নয়।

গুণ্ডা

গুণ্ডাসর্দার সুশীলের বৈঠকখানা।

ঘরখানায় আসবাবপত্রের সমাবেশে যেমন সাজানো গোছানোর কায়দায় তেমনি নানা বিচিত্র রুচির অদ্ভুত মিলন ঘটেছে। রুচির এই খাপছাড়া বিকারটাই চোখে পড়ে সকলের আগে। কল্পনা নেই, নানা রুচির সস্তা খিচুরি।

দেয়ালে বহু ছবি—শিবাজী, পরমহংস থেকে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, জহরলাল, সুভাষচন্দ্র, রাণী ভিক্টোরিয়া থেকে মাউন্টব্যাটেন দম্পতি, চার্চিল থেকে হলিউডের প্রায় ন্যাংটো ষ্টার বেনামী এবং জটাধারী সন্ন্যাসী থেকে বাসুকী নাগের দড়ি দিয়ে দেবতা ও দানবের সমুদ্রমন্থন। এসব হল কাগজে ছাপা ছবি। এসব ছাড়াও কার্পেটে রঙীন সুতো আর উলে তোলা হরিণ ও বাঘের মাথা আছে 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ' 'অহিংসা পরম,ধর্ম' 'পতিই সতীর সব' ইত্যাদি নানা রকম বচন আছে। একদিকে জোড়া খাটে ফরাস পাতা, তাকিয়া-গুলিতে ঝালর দেওয়া; অপরদিকে ষ্টিল প্লেটে ও ফ্রেমে গড়া অতি আধুনিক সোফা চেয়ার কিন্তু এপাশের দেয়াল ঘেঁষে আবার নিছক একটা সাদাসিদে কাঠের বেঞ্চি, কয়েকটা সস্তা হাটবাজারি বেতের মোড়া। একটা সাধারণ আলমারি আর দামী বুক সেলফে বিচিত্র মলাটের শ' তিনেক বই! এইগুলিতেই ধূলো জমেছে বেশী। রকমারী মলাটের শোভা ছাড়া বইগুলির সমাবেশ ঘটার মানে বোঝা অসম্ভব। শ্রীমতী সুশীলা দেবী নামে কোন এক অজানা মেয়ে কবির স্বামীর পয়সায় সোনালী জ্যোতির

চমক লাগানো হরফে ছাপানো "চাঁদ ছিল" কাব্যটির পাশেই আমেরিকায় প্রকাশিত জুতার ব্যবসা সম্পর্কে মোটা একখানা ইংরাজী বই!

মেঝের খানিক অংশ জুড়ে দামী কার্পেট, পুকুরের মিহি পাঁকের মত কোমলতায় আধ হাত পা ডুবে যায়। কার্পেটের পাশেই একটি সাধারণ মাদুর, তাতে গোটা দুই ওয়ারহীন তেলচিটে তাকিয়া। দরজার কাছে পা মোছার জন্য বিছানো আছে—দু'টি ছেঁড়া নোংরা বস্তা!

সকাল এখন সাড়ে সাতটা। ঘরে এত আসবাব থাকতে সুশীল একটা সাধারণ সস্তা ক্যাম্বিসের ক্যাম্প চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে একটি ছোট সাইজের দু'পৃষ্ঠা বাংলা সংবাদপত্র—ছাপার হরফ-গুলি বেশ বড় বড়।

সুশীলের বয়স হবে চল্লিশ—সবল স্থূল জবরদস্ত চেহারা, চর্বিতে মেটে রঙ। দাড়ি কামানো, ফড়িঙের ডানার মত একজোড়া সুন্দর গোঁফ আছে—সুশীলের কাছে যা যমজ ছেলের চেয়ে প্রিয়।

সুশীলের যমজ ছেলে ছিল। বিয়ে করা বৌয়ের সন্তান!

দেয়ালের ছবিগুলির মধ্যে সে ইতিহাস রক্ষিত আছে। শুকনো মালা জড়ানো বিবর্ণ অস্পষ্ট দু'টি ফটো সুশীলের অতীত দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি হিসাবে দেয়ালে ঠাঁই পেয়েছে। অস্পষ্ট হলেও বৌয়ের ফটোটি দেখে বোঝা যায় শাড়ী গয়না সিন্দুর চন্দনে জবুথবু একটি বালিকা চেয়ে আছে ড্যাবড্যাবে চোখে। বৌকে সুশীল বড় ভালবাসত! বাসর রাত্রে ভয়ে সুশীলের বুকে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে সুশীলকে সে মনেপ্রাণে বশ করে ফেলেছিল!

· যমজ ছেলে দুটি বিয়োতে তার প্রাণ যায়।

ছেলে দু'টি বেঁচেছিল প্রায় আটবছর। একসঙ্গে একদিনে দু'জনে

তারা কলেরায় মারা যায়। তাদের ঝাপসা ফটোয় কলকে ফুলের মালা জড়ানো আছে।

সন্তর্পণে পা ফেলে মৃণালিনী এসে দাঁড়ায়। সে চাকরাণী না আশ্রিতা না আত্মীয়া অথবা নিছক বেশ্যা চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই। পরণে চওড়া লাল পাড় ধোপদুরস্ত মিলের শাড়ী কিন্তু বহরে বেশ খানিকটা খাটো, হাঁটু পেড়িয়ে গোড়ালি অবধি যেতে যেতে মাঝপথে হাল ছেড়েছে। মুখখানা শুকনো, বঞ্চনা লাঞ্ছনার ছাপমারা বিবর্ণতা,—প্রাণপণ ধৈর্যের চেষ্টায় কালিমারা মুখের সে চামড়ায় বয়সের চিহ্নটা কিন্তু কুড়ি বাইশের বেশী উৎরাতে পারে নি। হাজার অত্যাচারও যে মানুষের মুখে বার্দ্ধক্য আনতে পারে না, তার মুখটি যেন তার চরম সাক্ষ্য।

মৃণালিনী। (মৃদুস্বরে) কি বলছেন?

সুশীল। এক কাপ চা দাও।

মৃণালিনী। কড়া করব না নরম করব?

সুশীল। মাঝারি রকম কর।

মৃণালিনী। (পাংশুমুখে ভীত স্বরে) মাঝারি রকম চা তৈরী করা আছে।

সুশীল। (উদার উদাস কণ্ঠে) মাঝারি রকম চায়ের নামে সেও এমনি ভড়কে যেত। একটু এদিক ওদিক হলে কড়া নয় নরম হয়ে যায়। তোমারও ভাবনা হচ্ছে, না? ভাবনা কি, ভাবনা কি! মন টন কি আর ভাল আছে সকালবেলা? যেমন হোক করে দাও। সংসারে আর মন নেই, বুঝলে? সংসার আর ভাল লাগে না।

মৃণালিনী। (সুশীলের বৌয়ের ফটোর দিকে চেয়ে) কি কচি ছিল মুখখানা। ছবিতেও যেন ঢল ঢল করছে।

সুশীল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) পাপে ভরা সংসার, ওসব মানুষ

বাঁচতে আসে না। দু'দিন জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে নিজে চলে যায়। চিহ্ন দুটোকে পর্যন্ত থাকতে দিল না, কাছে টেনে নিল।

মৃণালিনী। (ধরা গলায়) সত্যি, ভাবলেও কান্না পায়।

সুশীল। কাঁদছ? কাঁদলে তো তোমায় বেশ দেখায়!

মৃণালিনী। চা আনি।

মৃণালিনী ভিতরে যায়। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে বেলা। মোটাসোটা ফর্সা ও সুন্দরী, সাজসজ্জায় ঝলমল, গায়ে হীরার নমুনাও আছে। চেহারা প্রসাধন ও সাজসজ্জা সহজেই চিনিয়ে দেয় সে সমাজের কোন স্তরের কি ধরণের মানুষ।

বেলা। ছি ছি! এই নাকি তোমার নতুন পীরিত? কি পছন্দ বলিহারি যাই!

সুশীল। বড় ভাল মেয়েটি। সাত চড়ে মুখে রা নেই।

বেলা। তবে তো ভাল হবেই। চড় খেয়ে রা না কাড়লে আমিও ভাল মেয়ে হতাম। পাটরাণী করেছ নাকি শুনলাম?

সুশীল। কিসের পাটরাণী, একটু মায়া পড়ে গেছে, বাস্। চালান করেই দিতাম, গোঁসায়ের সাথে দরদস্তুর হয়ে গিয়েছিল। দু'দিন রেঁধে বেড়ে খাওয়াল, বেশ রাঁধে। ভাবলাম, আছে থাক। তাছাড়া, বড় নিরীহ গোবেচারা স্বভাব, কে বলবে স্কুলে পড়েছে। গোঁসায়ের কাজে লাগবে না, শেষকালে গাল দেবে আমায়।

বেলা। এ তো ভাল কথা নয়! এই বয়সে তুমি শেষকালে প্রেমের ফাঁদে আটক পড়লে? খবর শুনে আমরা তো থ' বনে গেছি বাবা। মেজাজ টেজাজ পর্যন্ত নাকি তোমার শুধরে গেছে!

সুশীল। শুধরে গেছে মানে?

বেলা। একেবারে নাকি দয়ামায়ার অবতার হয়ে দাঁড়িয়েছ।

মিষ্টি মিষ্টি কথা কও, উঠতে বসতে দরদ জানাও। মাইরি বলছি, সবাই বলাবলি করছে, তুমি নাকি শান্তশিষ্ট ভদ্দরলোকটি বনে গেছ।

সুশীল। ভদ্দরলোক ছিলাম না?

বেলা। তাই বলেছি আমি? কোঁদল করছ কেন গো? এ আবার শিখলে কোথা? একটা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে শেষে এমন দশা করলে তোমার!

সুশীল। হিংসা হচ্ছে নাকি?

বেলা। (নিজের গালে চড় মেরে মুখ বাঁকিয়ে) মরণ আমার, হিংসা হবে! তোমার ও দরদের মুখে নুড়ো জ্বেলে দি'।

সুশীল। তবে দোষটা কি হল? একজনকে করলাম বা একটু দরদ আহ্লাদ। বৌটাকেও তো একদিন করেছি, সম্পর্ক তো তুলে দিইনি তোমাদের সঙ্গে তখন।

বেলা। (গালে হাত দিয়ে) ওমা, তাই নাকি ব্যাপার! বৌটার মত লাগছে ছুঁড়িটাকে? তেমনি কথায় কথায় ভয়ে মুচ্ছো যায়, না?

মৃণালিনী একহাতে চায়ের কাপ অন্যহাতে চিনির পাত্র নিয়ে ঘরে আসে। বেলা একান্ত দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে। সুশীল মুচকে হেসে আড়চোখে তার দিকে তাকায়।

মৃণালিনী। আপনার চা এনেছি।

সুশীল। চা এনেছ? লক্ষ্মী মেয়ে। আজ চা ভাল হলে তোমার সোনার দুল গড়িয়ে দেব।

মৃণালিনী। চিনি কম দিয়েছি।

সুশীল। (চায়ের কাপ হাতে নিয়ে) কেন?

মৃণালিনী। চিনি আর চামচ এনেছি, একটু একটু মিশিয়ে দেব। রাগ করবেন না—

বেলা মুচকে হাসে। সুশীল চোখ পাকিয়ে চেয়ে কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকায়।

সুশীল। একেবারে চিনি দাও নি।

মৃণালিনী। একটু দিয়েছি, কম দিয়েছি। চিনি বেশী হয়ে গেলে মারবেন।

সুশীল। কি!

মৃণালিনী। (একটু পিছিয়ে গিয়ে) মারবেন না কিন্তু! চিনি মিশিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি।

সুশীল। (গর্জন করে) মারব? বজ্জাত হারামজাদি মাগি, সকালবেলা তুই এমন কথা বলছিস আমাকে! আমি মেয়েমানুষকে মারি? মেয়েমানুষের গায়ে আমি হাত তুলি? এক চাপড়ে গাল ফাটিয়ে দেব না তোর! আমি কি অসভ্য চাষা না মজুর যে মেয়েমানুষকে মারব? এমন কথা বলিস তুই, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! (বলতে বলতে রাগ চড়ছে, মুখ চোখ বিকৃত হয়ে গেছে) নে হারামজাদি নে! (পায়ের চটি খুলে মারল) আমি মেয়েলোককে মারি!

বেলা। (হেসে গড়িয়ে পড়ে) চিনির কৌটা আমাকে দাও। আমি চিনি মিশিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি।

সুশীল। (গজরাতে গজরাতে) না খেয়ে শুকিয়ে মরছিস, কুড়িয়ে এনে সুখে রেখেছি, তার মুখে কথা কি!

বেলা। (হাত বাড়িয়ে চিনির কৌটা আর চামচ নিয়ে) আমার জন্য এক কাপ চা করে আনো তো লক্ষ্মী মেয়ে!

মৃণালিনী ভিতরে যায়। সুশীলের চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে বেলা খিল খিল করে হাসে।

বাহিরে ঘরে

সকাল বেলা সদানন্দ রেশন আনতে বেরিয়েছে। গোমরা মুখটা যেন রাগে আর গায়ের জ্বালায় থমথম করছে। একটা ব্যাঙাচিকে ছেঁড়া চটি পরা পায়ে থেঁতলে থেঁতলে এমন করে মারে যেন লাথি মেরে মাথা ভাঙছে কোন অসহায় বিপন্ন শত্রুর।

রোয়াকে উবু হয়ে বসে গায়ের জ্বালায় জোরে জোরে বিড়িতে টান দিয়ে কাসছিল লক্ষ্মীপতি। সে কাসতে কাসতে প্রশ্ন করে, নতুন কোন আইডিয়া নাকি আনন্দদা?

রাস্তার কল থেকে জলভরা বালতি দুটো দু'হাতে ঝুলিয়ে আসতে আসতে হাঁপ ছাড়বার জন্য বালতি দুটো রাস্তায় নামিয়ে হাঁপাচ্ছিল রোগা রুগ্ন মাঝবয়সী রমানাথ। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, নতুন রকম কিছু নাকি? হাসতে হাসতে পেটটা ফাটাবেন না যেন বলে রাখছি আনন্দদা।

রাত তিনটেয় উঠে পড়ছিল গোপাল। পরীক্ষায় পাশ করবে না জেনেও পড়ছিল। উনানেয় ছাই কর্পূর আর পটাশ পারমাঙ্গানেটের ঘন রঙীন জলে গুলে কাদা করা খড়ি মাটীর ঘরোয়া সস্তা খাঁটি স্বদেশী পেষ্ট দিয়ে বিলাতী ব্রাশের সাহায্যে দাঁত মাজতে মাজতে সে সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ায়। বলে, সকাল বেলাই নতুন আইডিয়া মাথায় এসেছে? ইউ আর এ বেটার ভাঁড় দ্যান গোপাল ভাঁড় আনন্দদা'!

তার গালে একটা চাপড় কষিয়ে দেওয়া উচিত ছিল সদানন্দের।

কিন্তু চটবার উপায় তো তার নেই। সে কখনো চটে না বলে, সব সময় হাল্কা হাসিতামাসা নিয়ে সকলে সঙ্গে ইয়ারকি ফাজলামি করে জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার দিকটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় বলে অনেকে তাকে রীতিমত হিংসা করে। এতো সহজ ক্ষমতা নয় আজকের দিনে একটা সংসারী মানুষের পক্ষে!

সে তাই ভাঁড়ামির সুরেই বলে, সহজে কি হতে পেরেছি রে ভাই! ভাঁড়ামির পরীক্ষায় ফেল করতে করতে বেটার ভাঁড় হয়েছি!

গোপালের মুখ লাল হয়ে যায় কিন্তু অন্য সকলে হাসে।

লোকে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। যে দিনকাল, যে অবস্থা মানুষের, সামান্য উপার্জনে সংসার চালিয়েও কী করে সদানন্দ জীবনটা এমন হাল্কাভাবে নিতে পারে!

কেউ কেউ বলে, গায়ে একদিন ছুঁচ ফুটিয়ে দেখলে হত ব্যথায় মুখ বাঁকায় কিনা!

বুদ্ধিমানেরা বলে, কি বুদ্ধি তোমাদের! মনটা হাসিখুশি রাখার সঙ্গে শরীরের কি সম্পর্ক? যোগী সাধক মানুষ—সর্বদা আনন্দে থাকে। তাই বলে দেহে যন্ত্রণা হলে কাতরাবে না?

এই নিয়েও মত-বিরোধ আছে। কেউ তাকে বলে যোগী সাধক, কেউ বলে ভাঁড়।

দু'চারজনে পাগলও বলে থাকে!

রেশনের দোকানে দাঁড়িয়ে সে ভয়ার্ত সুরে সকলকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ মশায়, আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো? আমি আছি তো?

এযে তার নতুন তামাসার ভূমিকা সবাই তা জানে। সকলে মুচকে হাসে।

সকাল বেলা ঈশ্বরের নাম করতে গিয়ে বড়ই খটকা লেগেছে মনে। ঈশ্বর আছেন কি নেই আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাই না মশায়! মুস্কিল হল, আমি আছি কি নেই সেটা যে শুধু ঈশ্বর জানেন! আমি তবে জানব কি করে? মহা ভাবনায় পড়ে গেছি তাই।

একজন বলে, নাই বা রইলেন, অত ভাবনা কি?

· ওরে বাপরে! ভুয়ো রেশন কার্ডের দায়ে ধরা পড়ব না? বলতে বলতে একগাল হাসে।

এবার ধরেছি হিসেবটা। ঈশ্বর আছেন আমি যে এটা জানি, সেটাই প্রমাণ যে ঈশ্বরও জানেন আমি আছি। আমি যদি না থাকব তবে কি করে জানব একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আমি আছি কি নেই? কাজেই আমি আছি। সত্যি আছি তো?

কয়েক মুহূর্ত ভয়ার্ত দিশেহারা মানুষের মুখভঙ্গি অপূর্ব অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলে, বিহ্বল নেশাখোরের মত উপস্থিত সকলের মুখ, রাস্তা, সামনের বাগান বাড়ী আর আকাশের দৃশ্যমান অংশটুকুতে চোখ ঘুরিয়ে এনে নিজের পেট চাপড়ে হো হো শব্দে সে হেসে ওঠে।

আছি আছি, আমি আছি! রেশন নিতে এসেছিলাম আমি ভুলেই গেছিলাম বাবা! পেটে খিদেটা ছোবল মারছে সাতাশ কোটি সাপের মতো! আমিই যদি না থাকব, তবে কিসের রেশন, কিসের খিদে!

হাসতে হাসতে সেনেদের পাঁচবছরের মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, তুইও রেশন নিবি বৌ? একলা এসেছিস? মোটে শ'খানেক বছর আগে তোকে যে অসতী বলে ডুবিয়ে মারত বৌ-মণি, ভুলে গেছিস? কুলীন বামুন আমি, তোকে টাকা নিয়ে বিয়ে করে বলে যেতাম, খবর্দার, বাকী জীবন সতী থাকবি। পাঁচ ছ' বছর বয়স হয়েছে, বাকী মোটে আর তিরিশ চল্লিশটা বছর। আমাকে ধ্যান করে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দিবি, বুঝলি?

সকলে আবার হাসে। রেশনের দোকানে রেশন নিতে এসে হত্যা দিয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই হাসতে তো তারা ভুলে যায় নি।

ছোট মেয়েটির মাথায় পিঠে বাপের মত হাত বুলোতে বুলোতে সে একেবারে যাত্রাদলের ভাঁড়ের মত ভঙ্গি করে বলে, আপনারা তো জানেন না, আপনাদের কি বলব! সেদিন একটা মেয়ে আমায় বিয়ে করতে এসেছিল!

সে মুচকে মুচকে হাসে। সকলে উৎসুক আগ্রহে তার রসিকতার আসল কথাটুকুর জন্য প্রতীক্ষা করে। হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। তারা জানে যে রসিকতার ভূমিকা শুধু তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য—এবার সে যা বলবে তাতে না হেসে উপায় থাকবে না তাদের।

পর পর সাজান রেশন কার্ডগুলি নিয়ে যে বেচারা এ খাতায় ওখাতায় সে খাতায় এটা ওটা সেটা টুকে নিয়মরক্ষা করছিল—সে পর্যন্ত কলমটা উঁচিয়ে ধরে অপেক্ষা করে।

সে-ও তো পাড়ারই ছেলে।

সে হাসির গাম্ভীর্য দিয়ে মুখটা হাস্যকর ভাবে গম্ভীর করে বলে, ভারি সুন্দরী মেয়ে। কম খেয়ে ক্ষীণাঙ্গী হয়েছে। শাড়ীখানা পরেছে এমন কায়দা করে যেন সিনেমায় চাকরী খুঁজতে বেরিয়েছে! আমাকে সোজাসুজি বললে, ছাখো, তুমি বাপের সম্পত্তিও ভোগ করবে আবার মাসে মাসে চাকরি করে সে টাকাও মাসে মাসে খরচ করবে, অথচ ব্যাচেলার হয়ে থাকবে—এটা বে-আইনী কাজ। তোমাকে এভাবে সমাজের সর্বনাশ করতে দেওয়া যায় না। আমাকে বিয়ে করতে হবে। নইলে তোমার নামে কেস করব।

একটু থেমে মুখ গম্ভীর করে বলে, সে কি বিপদ ভাই! গলা জড়িয়ে ধরে আর কি! কি করি? শেষকালে গলা চড়িয়ে গিন্নিকেই ডাকলাম—ওগো বাঁচাও, শীগগির এসো—সবনাশ হল।

সশব্দে হাসিতে ফেটে পড়ে রেশনার্থী বালক যুবক বৃদ্ধেরা।

খদ্দরের শায়া ব্লাউজের উপর রেশন-বিগর্হিত সুপারফাইন শাড়ী গায়ে জড়ানো মোটাসোটা মহিলাটি বলে, আপনাকে থামে বেঁধে চাবকানো উচিত!

সে বলে, কেন? আমি তো মন্ত্রীদের গাল দিই নি।

সকলে আরেকবার হাসে।

মহিলাটি আরও চটে বলে, আপনি মেয়েদের অপমান করেছেন।

সে যেন আঁতকে ওঠে। মুখে ভয় আর হতাশার ভাবটা হাস্যকর রকম প্রকট হয়ে পড়ে।

এ কি বলছেন? কি সর্বনাশ! মেয়েরা যে আমার মা!

এবার কেউ হাসে না। ভদ্রমহিলা মুখ ফিরিয়ে ঝামটা দিয়ে বলে, ভাঁড়!

বরুণ বলে, মিসেস দাস, আপনি ওঁকে চেনেন?

মিসেস রেণুকা দাস শুধু মুখ বাঁকায়।

বরুণ বলে, উনিই আমাদের সদানন্দবাবু।

তাতে কি হয়েছে?

রাগ করবেন না, ইনি অতি সদাশিব লোক। কাউকে ইনি খোঁচা দেন না—এমনিই হাসান! আজকালকার দিনে পাড়ায় একজন হাসাবার মত লোক থাকা কি সহজ ভাগ্যের কথা!

লোকে না খেয়ে মরছে, ন্যাংটো হয়ে থাকছে, তখন ভাঁড়ামি সয় মানুষের? তাও আবার মেয়েদের নিয়ে ইয়ার্কি!

সদানন্দ গম্ভীর হয়ে বলে, এখানে আরও মহিলা উপস্থিত আছেন, তারা কিন্তু রাগ করেন নি।

রেণুকা ছাড়া যে পাঁচজন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল তাদের কেউ মহিলা বলে না। দু'জন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলেকের কাপড়ে স্পষ্ট ছাপ লাগানো আছে যে তারা নতুন বাড়ী তুলবার সময় চূণ বালি বয়, অন্য তিনজন বাঙ্গালী-স্ত্রীলোককে দেখেই বোঝা যায় পেট চালাবার জন্য তারা ঝি-গিরি ধরণের কাজ করে।

এবার কেউ শব্দ করে হাসে না, নীরব হাসিই সকলের মুখে খেলে যায়। রেণুকার মুখ হয়ে যায় আরও বেশী লাল।

রেশন-ক্লার্ক বরুণ তাড়াতাড়ি রেণুকার কার্ড ক'খানা আগে লিখে কেষ্টকে বলে, আগে এঁরটা মেপে দাও—হাত চালাও একটু।

সদানন্দ দু'হাতে নিজের কান মলে বলে, নাঃ, আর ভাঁড়ামি নয়। এবার থেকে রেশন নিতে এসে চোটপাট করতে হবে—তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব, সকলের আগে।

রেণুকা তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

গায়ে পড়ে সে সদানন্দকে শাসন করতে গিয়েছিল বলে কারো সহানুভূতি জাগে না। কেবল মাঝবয়সী আদিত্যের ক্লিষ্ট মুখটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখায়।

সে বলে, আমাদের রুচি বড় নেমে গেছে। সস্তা নোংরামি আর ভাঁড়ামি ছাড়া পছন্দ হয় না। সিনেমাগুলি তো নিয়ম করে বিষ খাওয়াচ্ছে দেশের লোককে!

কলেজের ছাত্র রঞ্জন বলে, পয়সা দিয়েও বিষ খায় কেন দেশের লোক?

সদানন্দ বলে, ও বিষ খেলে যে মজার নেশা হয় বে দাদা! পা টলে না, থানায় পড়তে হয় না, দিব্যি মজার নেশা জমে।

সকলে হাসে। আদিত্য নামকরা মাতাল। আর কোন দোষ নেই, বাড়ীতেই মদ খায়। যে আনন্দ জীবনে নেই সন্ধ্যা হলে সেই আনন্দের সন্ধানে মদ গিলতে সুরু করে। নেশা বেড়ে গেলে প্রায়ই সে বাড়ীতে একটা হৈ চৈ হট্টগোল সৃষ্টি করে।

সদানন্দ নিজের মুখে হাত চাপা দেবার ভঙ্গি করে বলে, আর না, এবার এই মুখ বন্ধ করলাম, একেবারে বাড়ী গিয়ে খুলব। আর একটি কথা নয়। একটা শব্দ যদি আর উচ্চারণ করি, নিজের মাথা খাব।

একটু পরেই বলে, দেখলেন তো মশাইরা, ভদ্রলোকের এক কথা। বলেছি মুখ বন্ধ, আর কি আমি কথা কই!

মুখ থেকে হাত সরিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, দুত্তোর! কত কথা বলে ফেললাম। ভদ্রলোকের এক কথা, নিজের মাথাটা এখন আমি খাই কি করে? নাগাল পাব না যে!

হাতে থলি ঝুলিয়ে চেনা লোকের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে করতে হাসিমুখে সদানন্দ বাড়ী ফেরে। সদর দরজার চৌকাট ডিঙ্গিয়েই হাসিটা তার মিলিয়ে যায়।

নির্মলা কুমড়ো কুটছিল, রেশনের চাল আর গমভরা থলি দুটো প্রায় তার গায়ের উপর ধপাস করে নামিয়ে দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলে, নাও পিণ্ডি গেলো সবাই।

নির্মলা বঁটিটা সরিয়ে রেখে ঝংকার বলে, হাত কেটে যেত না?

সদানন্দ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কাটে তো না কোন দিন? একটু রক্ত বেরিয়ে তেজ কমতো।

নির্মলার গলা চড়ে যায়।—কি তেজ আমার তুমি দেখলে শুনি? সকাল বেলা গায়ে পড়ে ঝগড়া সুরু করেছ?

সকাল বেলা এক কাপ চা জোটে না আমার। রেশনের দোকানে ধন্না দাও, বাজারে যাও—

ওই তো চা করা রয়েছে, খেলেই হয়!

সদানন্দ গর্জন করে বলে, ঠাণ্ডা চা খাব নাকি?

নির্মলাও গর্জে ওঠে, চেঁচিও না ষাঁড়ের মতো। গরম করে দেব না বলেছি?

আধ ভিজা কাপড়ে ষোল বছরের মেয়ে মায়া এসে দাঁড়ায়।

একটা কাপড়-কাচা সাবান এনে দাও বাবা

সদানন্দ তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

এখনও সাবান দিস নি কাপড়টাতে? কখন শুকোবে? কি পরে আপিস যাব?

সাবান নেই তো আমি কি করব?

ভোরবেলা সে কথা বলতে পার নি হারামজাদি?

সদানন্দ মেয়ের গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়।

মায়া চেঁচিয়ে কাঁদে।

নির্মলা তর্জন করে।

সদানন্দ গজরায়। তখন নড়ে ওঠে বাইরের কড়া।

দরজা খুলে সদানন্দ ছ্যাখে, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে রেশনের দোকানের সেই রেণুকা দাস।

একটু দরকার ছিল। আপনি তখন রাগ করেন নি তো সদানন্দবাবু?

সদানন্দবাবু অমায়িকভাবে হেসে বলে, রাগ তো আপনার করার কথা।

না না, আমি রাগ করিনি।

ঘরে এসে রেণুকা বসে।

একটা খবর পেয়ে এলাম। আপনি নাকি ঘরদুখানা ছেড়ে দিচ্ছেন? খোলা খুলি কথা বলি, কেমন? শুনলাম দু'মাসের ভাড়াটা দিয়ে আমি ঘর দু'টো নিতে পারি।

সদানন্দ বিমর্ষ চিন্তিত মুখে বলে, ঘর দুটো ঠিক ছেড়ে দেবার কথা ভাবিনি, একখানা ঘর সাবলেট করব ভাবছিলাম। তা, আপনি যখন বলছেন—

চিকিৎসা

ফুটপাথের ধার ঘেঁষে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। দেখেই টের পাওয়া যায় সহুরে মেয়ে। অর্থাৎ মফস্বল থেকে সহরে নতুন আমদানী নয়। রাজপথে চলার তার অভ্যাস নেই, খুব অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেও অবচেতনা তাকে আপনা থেকে কতকগুলি সতর্কতা পালন করায় না, এটা বিশ্বাস করাও কঠিন।

অথচ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে কোনদিকে না তাকিয়ে হঠাৎ রাস্তায় নেমে কয়েক পা এগিয়ে যায়।

স্কুল কলেজ আপিস যাবার সময় রাজপথে দ্রুতগামী গাড়ীর যে দুমুখী স্রোত চলছিল একেবারে তারই একটা ধারার মধ্যে!

মস্ত সেলুন গাড়ীটা তাকে চাপা দিয়ে আহত বা নিহত করলে কারো কিছু বলার থাকত না। এমন ভাবে যে চলন্ত গাড়ীর সামনে এসে পড়ে, প্রাণপণে ব্রেক কষেও বাঁচাবার সময় বা ফাঁক রাখে না, সোজাসুজি তাকে চাপা দেবার অধিকার নিশ্চয় সে গাড়ীর চালকের আছে।

কিন্তু গাড়ীও মানুষ চালায় কিনা এবং জগতে এত সমারোহের সঙ্গে ছোট ও বিরাট স্কেলে মানুষ মারা হয়ে থাকলেও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়াটাই মানুষের ধাত কি না, দুর্ঘটনাটা তাই হয়ে যায় একটু অন্যরকম।

ভাবনা চিন্তার তো সময় ছিল না, সেলুন গাড়ীর মোটা সোটা বেঁটে ড্রাইভারটি যা করে তার পিছনে নিজেকে বিপন্ন করেও মানুষকে বাঁচাবার প্রকৃতিগত ঝোঁকটাই ছিল বলতে হবে।

তা ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যাই হয় না তার কাজের। দাঁতে দাঁত চেপে ব্রেক কষার সঙ্গে সে ডাইনে হুইল ঘুরিয়ে দেয়। বাঁয়ে ফুটপাতে মানুষের ভিড়। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে দশ জনকে মারা বা জখম করার মানে হয় না। মেয়েটি ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে। গাড়ীটা ধাক্কা দেয় চলন্ত ট্রামটার গায়ে।

অদ্ভুত একটা আর্তনাদের মত আওয়াজ ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলি গাড়ীর ব্রেক কষায়।

সেলুন গাড়ীটার পিছনে আসছিল লম্বাটে পুরাণো বড় একটা গাড়ী। ব্রেক কষেও সেটা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেলুনটার উপরে।

পিছনের সিটের এদিকের কোণে যে প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোকটি বসেছিল, চোট লেগে সে অজ্ঞান হয়ে পাশের সুন্দরী মেয়েটির কোলে ঢলে পড়ে—সিনেমার চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে আসল রসালো দৃশ্যটির মতই!

কী বিরাট ছন্দে কী গতিতে সহরের এই রাজপথে জীবনের স্রোত বয়ে চলেছিল, কী বিচিত্র অদ্ভুত ছিল হেঁটে চলা ট্রামে বাসে গাদাগাদি করা নানা আকারের নানা ধরণের ছোট বড় নতুন পুরাণো মোটর গাড়ীতে চাপা রিক্সা সাইকেলে বসা মানুষগুলির বিভেদ আর সামঞ্জস্য—ব্যাঘাত ঘটে থেমে যেতেই যেন সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্র্যাফিক বন্ধ।

পুলিশ আসে নি, অ্যাম্বুলেন্স আসে নি কিন্তু লোকারণ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। সে অরণ্য ভেদ করে সাইকেলটিরও এগিয়ে যাবার সাধ্য নেই।

বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টর নিত্যই দেখছে এরকম দুর্ঘটনা। একটা ফাঁক পেলেই হুস করে বেরিয়ে যেত ঘটনাস্থল পিছনে ফেলে। তাদের টাইমের সার্ভিস। দেরী হলে জরিমানা—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আপিস টাইমে আধঘণ্টা রোজগার বন্ধ থাকলে মালিক বড় চটে যায়।

বলে, চোখ কাণ নেই ? সেন্স নেই ? অ্যাকসিডেন্ট ঘটলে ট্র্যাফিক বন্ধ হলে আধঘণ্টা একঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে খেয়াল নেই ? হুস্ করে বেরিয়ে যেতে পারলে না ? পাশের রাস্তায় ঢুকে একটু ঘুরে আসতে পারলে না ? বাস কিনে হয়েছে ঝকমারি। তোমাদের পেটেই সব যায় !

বোঝাই বাস, মাল বোঝাই লরী, মাল বোঝাই নিতে যাবার খালি লরী, উগ্র অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পারলে যেন জনতাকে পিষে বেরিয়ে চলে যাবে।

পুলিশ না এলে তো আর সে সাহস সম্ভব নয়। শুধু ফোঁসে আর গর্জায়।

জনতা রাস্তা ছাড়ে না।

তারপর পুলিশ আসে। অ্যাম্বুলেন্স আসে।

সামান্য ব্যাপার। শুধু একটু ঠোকাঠুকি হয়েছে চলতি কয়েকটা গাড়ীর।

কেউ মরেনি।

দুর্ঘটনার কারণ সেই মেয়েটার বাঁ হাতটা শুধু গুঁড়ো হয়ে গেছে আর ভেঙেছে দুটো একটা পাঁজরার হাড়। সেলুন গাড়ীর মোটাসোটা বেঁটে ড্রাইভারের ঘাড়টা শুধু একটু মচকে গেছে। বেশীরকম মুচড়ে গেছে বলেই জ্ঞান হারিয়েছে, নইলে আঘাত তার তেমন মারাত্মক কিছু লাগেনি। কোথাও কাটেনি, রক্তপাত ঘটেনি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কেন জ্ঞান হারিয়েছে বোঝাই যায় না। বোধ হয় দেহযন্ত্রে কোন বিকৃতি আছে। হঠাৎ আঁতকে উঠলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। নইলে এত সামান্য একটু ঝাঁকানিতে কেউ এভাবে অচেতন হয় না।

ওই গাড়ীর ড্রাইভারের চোট লেগেছে বরং অনেক বেশী।

কপালের পাশের দিকটা অবশ্য দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। কিন্তু একফোঁটা রক্তপাত যার ঘটেনি তাকে আহত বলা যায় কোন যুক্তিতে!

কেউ মরে নি, রক্তপাত হয় নি, সুতরাং সামান্য দুর্ঘটনাই বলতে হবে।

মিনিট কুড়িও লাগে না রাজপথটির ধাতস্থ হতে।

তারপর ঠিক আগের মতই অবিরাম গতিতে মানুষ ও গাড়ীর চলাচল দেখে মনে হয়, দুর্ঘটনার চিহ্ন কেন, স্মৃতি পর্যন্ত যেন উপে গিয়েছে।

সামনে খানিকটা ফাঁক পাওয়ায় পিছনের যে গাড়ীটা ব্রেক কষে থামবার সুযোগ পেয়েছিল, কারো এতটুকু চোট লাগে নি তার ড্রাইভার জীবন ফুটপাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে।

একটার পর একটা।

ভূপেশ বলে, দাঁড়িয়ে রইলে যে জীবন? গাড়ীতে ষ্টার্ট দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

জীবন একটা ঢোঁক গেলে।

সন্ধ্যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার মুখ এরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

প্রাণপণ চেষ্টায় মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করতে করতে জীবন বলে, ও কিছু নয়। শরীরটা আজ ভাল নেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে সে গাড়ীতে ওঠে। ভেতরে তার যে কি ব্যাপার চলেছে, মাথা ঘুরছে বুক ধড়ফড় করছে, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে এটা ওদের জানতে দেওয়া যায় না।

একটা দুর্ঘটনা ঘটবার এতক্ষণ পরেও যার ভেতরে এমন ব্যাপার

চলে, তাকে গাড়ী চালাবার ভার দিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে ওরা সাহস পাবে না, আজকেই মাইনে হাতে দিয়ে বলবে, ভালয় ভালয় বিদেয় হও!

এমনি ওরা তাকে পছন্দই করে ড্রাইভার হিসাবে, তার সাধারণ কথাবার্তা চালচলনও অপছন্দ নয়; কিন্তু সে জানে মাঝে মাঝে তার মুখ যে খুব শুকনো আর বিষণ্ণ দেখায়, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, ডাকলে কখনো চমকে উঠে খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—এসব লক্ষ্য করে ওদের মনে একটা খটকা লেগেছে।

একবার যদি টের পায় তার সত্যিকারের অবস্থা আর একদিনও ওরা তাকে রাখবে না।

ভূপেশ আর সন্ধ্যাকে আপিসে পৌঁছে দিলে ভূপেশ বলে, আজ আর আমাদের গাড়ীর দরকার নেই। বাড়ীতে ওরা কোথায় যাবে বলছিল, গাড়ী নিয়ে যাও।

গাড়ী নিয়ে ফিরে গিয়ে জীবন অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে। খেয়ে দেয়ে আবার বিছানা নেয়, কিছুক্ষণের জন্য একটু তন্দ্রাও আসে, তবু বাড়ীর মেয়েদের সিনেমায় নেবার জন্য গাড়ী বার করার সময় তার বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে, সর্ব্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসে। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গ্যারেজে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে হয়।

সন্ধ্যায় বাড়ীতে আসে অতিথি, হাসি গল্প গানে ড্রয়িং রুমটা যেন আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে জীবন ভাবে, চোরাবাজারে টাকা করেও জীবনটা ওরা হাসি আনন্দে ভরে তুলতে পারে, কারও কিছু চুরি না করেও তার জীবনটা এমন দুঃখময় কেন?

শাড়ী গয়নায় চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে আসে। ভূপেশের স্ত্রী প্রৌঢ়া সুপ্রিয়াও যেন নিজের মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেজেছে।

তার দিকে চেয়ে জীবন কিছুক্ষণের জন্য তার নিজের চিন্তা ভুলে যায়। ভাবে, ভূপেশ যে সন্ধ্যাকে শুধু তার বাড়ী থেকে তুলে নিজের আপিসে নিয়ে যায় না, সিনেমা হোটেলেও নিয়ে যায়, ফিরিঙ্গি পাড়ায় ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা সাজানো ঘরেও নিয়ে যায়, এটা জানলেও কি তুমি এরকম সেজেগুজে হাসিমুখে সিনেমায় যেতে পারতে ?

জীবনের মাথা ঘোরে।

বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে। হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে হাত পা কাঁপে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। জল খেয়ে লাভ হয় না। জলে গলাও ভেজে না, তৃষ্ণাও মেটে না।

বেশী জল খাওয়ার দরুণ শুধু আরেকটা অস্বস্তি বাড়ে।

খিদে পায় এলোমেলোভাবে। কখনো অসহ্য চনচনে খিদে পায়, কখনো ভোঁতা হয়ে যায়। ভাল হজম হয় না। আর হয় না ঘুম।

নিয়মিত ভাবে নয় কিন্তু পালা করেই তার দুঃখের দিনগুলি আসে।

কদিন ভালই আছে, শরীরটা তাজা বোধ করছে, মনে অনুভব করেছে ফুর্তির ভাব, জগৎটাকে মনে হচ্ছে খাসা যায়গা, জীবনটা মনে হচ্ছে আনন্দময়—স্বপ্নের মতই যেন কেটে যায় এ অবস্থাটা, দুঃস্বপ্নের মতই যেন সুরু হয় অস্বস্তি যাতনাবোধ অনিদ্রা আর আতঙ্কের দিনগুলি।

চেনা ডাক্তারকে দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করানো হয়েছে দেহটা এবং রক্ত থুথু ইত্যাদি সব কিছু।

কোন খুঁত পাওয়া যায় নি।

: রোগটা বোধ হয় আপনার মানসিক।

: মানসিক কি রোগ ?

—সেটা স্পেশালিষ্ট বলতে পারবেন। আমার মনে হয় আপনি খুব দুশ্চিন্তা করেন।

—শরীরটা বিগড়ে যায় কেন এ ছাড়া আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। কোন ঝনঝাট নেই।

—আপনি একবার কুমুদবাবুকে কনসাল্ট করুন।

কুমুদের ফি ভীষণ মোটা। তবে ডাক্তারি বিদ্যায় বা যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করায় তার ফাঁকি নেই।

প্রথম দিন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে কুমুদ নানাভাবে এই কথাটাই তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল যে কারণ না জেনে রোগের চিকিৎসা করার সাধ্য ভগবানের থাকতে পারে কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ ডাক্তারের নেই এবং কোন কথা গোপন করলে রোগের কারণ খুঁজে বার করবার সাধ্য ডাক্তায়ের হয় না।

কোন কথাই সে গোপন করে নি কুমুদের কাছে। বলেছে, আমার জীবনে কিছুই গোপন করার নেই। অল্পবয়সে দু'একটা ছেলেমানুষী হয় তো করেছি, তারপর ভুলটুলও হয় তো করেছি দু'একটা। কিন্তু সে সব এমন ব্যাপার নয় যে আপনাকে বলতে পারব না।

কুমুদ প্রশ্ন করেছে, সে জবাব দিয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকে তার নিজের জীবনের কথা, বাড়ীর লোকের কথা বন্ধু-বান্ধবের কথা সব বিষয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে প্রশ্ন।

একদিনে হয়নি অনেকদিন যেতে হয়েছে কুমুদের কাছে।

এটা সম্ভব হয়েছে কুমুদের কাছে তাকে যে পাঠিয়েছে তারই মধ্যস্থতায়।

শঙ্কর ডাক্তার কুমুদের পরিচিত, তারই অনুরোধে কুমুদ তার পাওনাটা জীবনের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু করে নিতে রাজী হয়েছে।

শঙ্কর জোর দিয়ে কুমুদকে বলেছে, একবারে সব টাকা দিতে হলে সে চিকিৎসা চালাতে পারবে না। ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি, মানুষটা সত্যি অনেস্ট। আপনার পাওনা এক পয়সা মারা যাবে না।

প্রথমে একটু উদাসীনভাবে আরম্ভ করলেও কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তার অসুখটার চিকিৎসা করতে কুমুদের যেন বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

প্রশ্নগুলি অবশ্যই চিকিৎসার পদ্ধতি অনুসারে সাজানো কিন্তু জীবনের কাছে ভারি এলোমেলো ঠেকে। কিন্তু ভাল করে তার রোগটা বুঝবার জন্য কুমুদের আগ্রহ সে টের পায়।

আশা জাগে জীবনের। কুমুদের মত ডাক্তার এতখানি আগ্রহের সঙ্গে এত যত্ন নিয়ে যখন তার চিকিৎসা করছে, হয়তো সেরে যাবে তার দুর্বোধ্য অসুখ—ভিতরে আড়াল করা অসুখ।

দু'তিন রকম ওষুধের ব্যবস্থাও করেছে কুমুদ। একটু খিদে বেড়েছে, মোটামুটি ঘুমও হয়।

সেরকম কষ্টকর হয়ে ওঠে না মাথা ঘোরা বুক ধড়ফড় করা গলা শুকিয়ে যাওয়া।

এইখানেই কিন্তু থেমে গেছে উন্নতি। আগের মত কষ্টকর না হলেও অসুখটা তার রয়ে গেছে।

কেমন বিচলিত মনে হয়েছে কুমুদকে।

একদিন সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তুমি নিশ্চয় আমার কাছে কোন গুরুতর কথা গোপন করছ।

—গুরুতর কথা ডাক্তারবাবু? কোন সামান্য তুচ্ছ কথাও গোপন করিনি।

কুমুদ মাথা নাড়ে।

—আমি স্পষ্ট ধরতে পেরেছি তোমার মধ্যে একটা কঠিন অশান্তি আছে, জোরালো সংঘাত চলছে। ব্যাপারটা না জানালে তো তোমায় সারাতে পারব না।

—সে তো এই অসুখটার জন্য। আগে অশান্তি ছিল, কোন কাজ ছিল না বলে, বড় দুরবস্থা হয়েছিল। ক'বছর ভাল মাইনের কাজ করছি, একরকম চলে যায়। এখন এই রোগটা ছাড়া আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

কুমুদ বলে, না। অসুখের জন্য তোমার আসল অশান্তিটা নয়—ওই অশান্তিটার জন্যই তোমার অসুখ। এতে কোন ভুল নেই, এটা ধরতেও আমার অসুবিধা হয় নি! এটার রকমটাও আমি ধরতে পেরেছি ঠিক। গোপনে মানুষ খুন করার মত খুব বড় রকম একটা পাপ করলে যেমন প্রতিক্রিয়া হয়, সেই ধরণের ব্যাপার। তোমার জীবনে নিশ্চয় একটা বড়রকম গোপন দিক আছে, নইলে এ রকম হতেই পারে না। আমাদের বিজ্ঞানের হিসাব ভুল হবার নয়। তোমার জীবনে গোপন দিক আছে এটা আমার আন্দাজ নয়। ডাক্তার যেমন স্পষ্ট লক্ষণ পেলে বলে দিতে পারে রোগীর শরীরে কি অসুখ, তেমনি স্পষ্ট লক্ষণ থেকে আমি তোমার ভেতরের ব্যাপারটা ধরেছি, এতে ভুল হওয়া অসম্ভব।

জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার জীবনের একটা বড় গোপন দিক আছে, মানুষ খুন করার মত সাংঘাতিক দিক, অথচ সে নিজেই তার কোন খবর রাখে না!

কুমুদ বলেছে, এভাবে গোপন করলে তো চিকিৎসা সম্ভব নয়। গুরুতর ব্যাপার একটা আছে, ভেতর থেকে চাপ দিচ্ছে, তার লক্ষণগুলি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা কি না জানলে তো চিকিৎসা করতে পারব না, তোমার রোগও সারবে না!

জীবন ব্যাকুলভাবে বলে, বিশ্বাস করুন, আমি কোন কথা গোপন করি নি।

কুমুদ অনেকক্ষণ ধুপ করে থাকে। তরপর ধীরে বলে, যদি ক্রিমিনাল কিছু হয়, বিপদে পড়ার ভয়ে বলতে বাধছে, তাহলে তোমায় আবার বলছি যে তুমি মস্ত ভুল করছ। তোমাকে বিপদে ফেলা যায় এমন কিছুই আমি জানতে চাই না। কারও নামধাম, কোথায় কবে ব্যাপারটা ঘটেছিল, এসব আমার জানবার দরকার নেই। এসব পয়েণ্ট তুমি গোপন রাখতে পার, বানিয়ে বলতে পার। আমি শুধু জানতে চাই ব্যাপারটা কি ধরণের আর কি ভাবে তার জের চলছে।

একটু থেমে কুমুদ আবার বলে, যেমন ধরো তুমি একটা খুন করেছিলে। কবে কাকে কি ভাবে খুন করেছিলে তোমায় বলতে হবে না। আমায় শুধু জানাবে কেন খুনটা করতে হয়েছিল, এখনো তার জেরটা চলছে কেন। তুমি সত্যি খুন করেছ বলছি না কিন্তু। আমি তোমায় শুধু এটুকু বোঝাতে চাইছি যে খুন করে থাকলেও আমায় যেটুকু জানালে আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারব না—আমায় সেইটুকু শুধু জানাও। যদি অন্যায় প্রেমেব ব্যাপার হয়, আমাকে শুধু এইটুকু বলবে, আর কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে যা থেকে আমার জানার সাধ্যও হবে না কার সঙ্গে তোমার অন্যার প্রেম চলেছে।

জীবন ক্ষুব্ধস্বরে বলে, আপনি যেন ধরেই নিয়েছেন আমি মস্ত একটা পাপ করেছি, এখনও তার জের টানছি।

—আমাকে সেটা ধরে নিতেই হবে। নইলে চিকিৎসা শাস্ত্রটা মিথ্যা হয়ে যায়। আমার হিসাবে পাপ নয়, তোমার কাছে পাপ। এই বিকারটা তোমার মধ্যে আছে। তা না হলে এরকম অসুখ তোমার হতেই পারে না। ওটার চিকিৎসাই আমাকে করতে হবে।

জীবন হতাশ হয়ে বলে, আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, কি বলব বলুন। ছোটখাট পাপকর্ম্ম করেছি বা করছি বলে তো আমার জানা নেই!

কুমুদ গম্ভীর গলায় বলে, তাহলে আর টেনে কাজ নেই। তোমার কাছে আমার যা পাওনা আছে সেটা আর তোমাকে দিতে হবে না।

—তাকি হয় ডাক্তারবাবু! অ্যাদ্দিন চিকিৎসা করলেন, আপনার পাওনা টাকা আপনাকে দেব বৈকি!

এ জীবনে আর অসুখটা সারবার আশা সে রাখে না।

কুমুদের মত ডাক্তার যদি রোগ ধরতে না পেরে এমন আবোল তাবোল কথা বলে, জীবনে বিশেষ কোন অন্যায় কোন দিন না করে থাকলেও গায়ের জার দাঁড় করায় যে কোন গুরুতর অন্যায় করার জন্যই তার এই রোগ, তাহলে আর সে কার কাছে যাবে, রোগ সারবার আশা করবে?

শঙ্কর ডাক্তার দেহটা সবরকমে পরীক্ষা করেও কোন কারণ খুজে পায় নি। কুমুদ ডাক্তার তার মনকে পরীক্ষা করে বার করল এক কল্পিত বারণ। তার দেহ খুঁজে মন খুঁজে যদি সঠিক কারণটা না পাওয়া যায়, তবে আর আশা করা যায় কি করে?

এটা তাহলে কোন রোগ নয়। এরকম যে তার হয় এটাই তার ধাত।

এই অস্থিরতা, কষ্টবোধ অনিদ্রা অরুচি এ সমস্তের যে আক্রমণ হয় সেটা তার রক্তমাংসে জড়িয়ে আছে। চিকিৎসায় এর আর কোন প্রতিকার নেই।

বড় একটা দাঁও মেরে মোটা টাকা লাভ করে ভূপেশ একটা ঝক্

ঝকে নতুন গাড়ী কেনে। কিন্তু এমন সুন্দর দামি নতুন গাড়ী চালাবার আরাম, অন্য অনেক ধ্যাড়ধ্যেড়ে গাড়ীর ড্রাইভারদের ঈর্ষাতুর দৃষ্টি, দশটাকা বেতন বৃদ্ধি, কিছুই যেন খুশী করে না জীবনকে। কলকাতার রাস্তায় নতুন গাড়ী চালাতে তার যেন আরও বেশী ভয় করে, অস্বস্তি বোধ হয়।

সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে গাড়ীর এবং ভূপেশের রুচির প্রশংসা করে। এই গাড়ী চেপে আপিসে যাওয়া আসায় আনন্দে আরামে ও গর্ব্বে যেন প্রকাশ্য পথেই নেতিয়ে পড়তে চায় ভূপেশের গায়ে।

বোধ হয় এই জন্যই অথবা পুরাণো হয়ে যাওয়ায় তাকে আর ভাল লাগছিল না বলে অথবা অন্য একজনকে পছন্দ হয়েছে বলে, কাজের চাপ আর সময়ের অভাবের অজুহাতে ভূপেশ সন্ধ্যাকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আপিস যাওয়া আর তাকে বাড়ী পৌছে দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

নলিনীকে আপিসে চাকরী না দিয়েই বিকালের দিকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে সিনেমায় হোটেলে যায়।

সুপ্রিয়া আর তার ছেলেমেয়েদের সাজ-সজ্জার চাকচিক্য, সিনেমা দেখা, বন্ধুদের বাড়ীতে এনে হৈ চৈ করা বেড়ে গেছে।

সকলেই ফূর্তিতে ডগমগ—অন্তত: বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয়। মুখ শুধু শুকনো আর ক্লিষ্ট জীবনের।

বাড়ীর সবাই নতুন গাড়ী চেপে মজা করতে যেতে চায়।

বড় ছেলে মোহিত আর মেজ মেয়ে নলিনী দুজনেই সেদিন সকালে ভূপেশের কাছে প্রায় একসঙ্গে দরবার করতে যায় যে দুপুরবেলা দু'ঘণ্টার জন্য গাড়ীটা চাই।

ভূপেশের বড় মেয়ে মোহিনী বিধবা।

ভূপেশের কাছে প্রথমে গিয়েছিল নলিনী। টের পেয়েই মোহিত তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হয়।

বলে, আমার আজকে গাড়ী চাই-ই বাবা।

নলিনী হেসে বলে, আমি আগেই বাগিয়ে নিয়েছি।

দুজনে বেধে যায় প্রচণ্ড কলহ। যেন আঁচড়া আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি হয়ে যাবে!

ভূপেশ এক ধমকে তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়ে বলে, আজ একজন কাল একজন নাও না? গাড়ী কিনে ঝকমারি হয়েছে। এমন কি জরুরী কাজ তোমাদের যে আজ গাড়ী না হলেই চলবে না! তুই তো বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে যাবি, মোহিত যখন বলেছে ওর জরুরী কাজ আছে, আজ ও-ই গাড়ী নিক। তুই কাল বেরোস।

ভূপেশ ধমক দিয়ে কথা কইলে ছেলেমেয়েরা আর মুখ খুলতে সাহস পায় না। সেকালের রাজার হুকুমের মতই তার কথা সকলে নীরবে মেনে নেয়।

তখন ধীরে ধীরে আসে মোহিনী। বিধবার সাদা বেশেও যে এমন চাকচিক্য আনা যায় তাকে না দেখলে ধারণা করা কঠিন।

সে ম্লান মুখে বলে, বাবা, আমি আজ নতুন গাড়ীটা নিয়ে একটু বেরোব। আজ ওনার মৃত্যুদিন। ওঁর মা ভাইবোনেদেব সঙ্গে দেখা করে আসব।

ভূপেশ বলে, ট্যাক্সিতে গেলে হয় না?

—না আমার গাড়ীটা চাই।

তবে আর কথা কি।

ভূপেশ মেহিত আর নলিনীকে বলে, তোমরা কাল পরশু গাড়ী

পাবে। এরকম সিরিয়াস ব্যাপারে আমি তো মোহিনীকে না বলতে পারি না।

মোহিনী উদাসীনার'মত বলে, আমায় একশোটা টাকা দিও বাবা।

বাপের একশো টাকা নিয়ে বাপের নতুন গাড়ীতে চড়ে মোহিনী বার হয়।

এ রাস্তাটা চওড়া এবং এটার নাম রোড, দেশের একজন নমস্ত ব্যক্তির নামে। কিন্তু একটা দিক বন্ধ এ রাস্তাটার।

বড় রাস্তার মোড়ে পৌছবার আগেই জীবন জিজ্ঞাসা করে গাড়ী কোনদিকে যাবে।

মোহিনী মুচকে হেসে বলে, যেদিকে তোমার খুশী।

জীবন বলে, কোথায় যাবেন না বললে—

মোহিনী বলে, বললাম তো, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেই-খানেই যাব। সোজা কথা বুঝতে শেখো। এখানে গাড়ী থামিয়ে রেখোনা, পাড়ার লোক দেখছে।

পিছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকে একশো টাকার নোট সে জীবনের বুক পকেটে গুঁজে দেয়।

নিশ্চিন্ত মনে সিটে বসে বলে, রাত দশটা হোক এগারটা হোক, গাড়ী নিয়ে ফেরবার জন্য ভেবোনা। আমি সামলে দেব, তোমার কোন দোষ হবে না। বলব যে একটু সভাটভা হয়েছিল, স্মৃতিপূজা হয়েছিল তাই ফিরতে পারি নি।

বুক পকেট থেকে নোটগুলি বার করে জীবন মোহিনীর কোলে ছুঁড়ে দেয়। বলে, আমার মাথা ঘুরছে, গা গুলোচ্ছে, চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। চালাতে পারব না। আজ গাড়ী চালাতে গেলেই এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যাবে।

গাড়ী ঘুরিয়ে আনার জন্য বড় রাস্তায় তাকে যেতে হয়। বড় রাস্তায় গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে সে মোহিনীকে নামিয়ে দিয়ে গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

গায়ের জ্বালায় বানিয়ে বানিয়ে মোহিনী কি বলে সেই জানে, খানিক পরেই ভূপেশ জীবনকে ডেকে পাঠায়। জীবন গিয়ে ছাখে রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছে ভূপেশ।

সে গিয়ে দাঁড়াতেই যা-তা গালাগালি সুরু করে পায়ের চটি খুলে হাতে নেয়।

কিন্তু জীবনের মুখ আর হাত থেমেও যায় আচমকা। সে বোধ হয় কল্পনাও করে নি যে নিরীহ শান্ত প্রকৃতির জীবন এমন ভাবে রুখে উঠতে পারে।

মাথা উঁচু করে জীবন বলে, আমারও মুখ আছে, পায়ে জুতো আছে, সেটা ভুলবেন না।

কি স্পর্দ্ধা মানুষটার!

কিন্তু আর গালাগালি দিতে সাহস হয় না ভূপেশের। তার বড় ছেলে বলে, তোমায় আমরা পুলিশে দেব।

জীবন বলে, তা দিতে পারেন। একটা কিছু মিথ্যা দাঁড় করালেই হল। সেটা আপনাদের জানা আছে।

ভূপেশ বলে, তুমি এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও।

—আমার মাইনে চুকিয়ে দিন।

—মাইনে পাবে না।

জীবন ধীরে ধীরে বলে, দেখুন, একটা কথা ভুলবেন না। গাড়ীর ড্রাইভার অনেক ভিতরের কথা জেনে যায়। আমি অনেক ব্যাপার জানি, ফাঁস করে দিলে বেশ মুস্কিলে পড়বেন।

মাইনে নিয়ে ছোট্ট সুটকেশ আর বিছানার বাণ্ডিল হাতে জীবন রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

কোথায় যাবে ঠিক নেই, আরেকটা চাকরী জুটিয়ে নিতে কতকাল লাগবে জানা নেই, কিন্তু রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে জীবন মনে প্রাণে একটা অদ্ভুত রকম স্বস্তি অনুভব করে।

ভিতরে একটা বিশ্রী কষ্টকর চাপ যেন হঠাৎ কমে গেছে, একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে দেহমন!

এত স্পষ্ট হয় অস্বস্তি কেটে গিয়ে স্বস্তি বোধ, করাটা একটা দুঃসহ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ যে জীবন সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

একটা সস্তা হোটেলে গিয়ে ওঠে। তক্তপোষে বিছানাটা পেতে ঠিকঠাক করে নিতে নিতে ওই আরামটাই যেন গাঢ় ঘুম হয়ে তার চোখে ঘনিয়ে আসে।

বিছানায় শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে সে অচেতন হয়ে যায়। সন্ধ্যা-বেলা ঘুম ভাঙ্গতে মনে হয় শুধু স্বস্তি নয়, একবেলা ঘুমিয়ে শরীর মন যেন আশ্চর্য্যরকম তাজা হয়ে উঠেছে।

পরদিন সে কুমুদের কাছে যায়।

বলে, ডাক্তারবাবু, আপনি ঠিক বলেছিলেন। আপনাদের কি ভুল হতে পারে! আমি সত্যি একটা মস্ত পাপ করছিলাম কিন্তু নিজেকে অন্যরকম বুঝিয়েছিলাম বলে ধরতে পারি নি পাপ করছি।

কুমুদ বলে, এখন ধরতে পেরেছ?

জীবন সায় দেয়।

—পেরেছি বৈকি। প্রায় চার বছর ধরে আমি একটা মহাপাপী বদলোকের কাছে চাকরী করছিলাম। প্রথমে তবু পদে ছিল, তারপর কত রকম অকাজ কুকাজ যে করেছে, কত লোকের ঘাড় যে ভেঙ্গেছে! বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বজ্জাত

হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সব জেনেও নিজেকে কি বোঝাতাম জানেন আমি ড্রাইভার, আমি খেটে পয়সা রোজগার করছি, ও লোকটা কি? করছে না করছে আমার তা দেখবার দরকার কি! কাল একটা ব্যাপার ঘটায় আমাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কি উপকারটাই যে করেছে তাড়িয়ে দিয়ে। এখন বুঝতে পারছি ওদের অত বজ্জাতি আমার সইছিল না। গাড়ীতে চেপে হাজার হাজার লোকের ঘাড় ভাঙ্গার ব্যবস্থা করতে যাবে, গরীব নিরুপায় মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে যাবে—গাড়ী চালাব আমি কিন্তু ভাবব যে আমি তো কিছু করছি না—সে হয় না।

কুমুদ একটু হাসে।

জীবন বলে, আর চিকিৎসার দরকার হবে না। আমার রোগ আরাম হয়ে গেছে।

মীমাংসা

রাত নটার সময় গম্ভীর চিন্তিত মুখে পঙ্কজ বড়ি ফেরে।

আজ আর কাগজের অপিসে বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। এত আশা করে বেরিয়েছিল যে টাকার ব্যবস্থা বোধ হয় হয়ে যাবে, সম্ভব হবে সঙ্কট কাটিয়ে উঠে কাগজটা চালু রাখা।

ভূদেবের মুখ দেখেই সে অনুমান করেছিল, আশা তার পূর্ণ হবে না। টাকার জন্য ভূদেবের যে চেষ্টা সফল হবে মনে হচ্ছিল, সেটা নিশ্চয় ভেস্তে গেছে!

ভূদেব অবশ্য প্রথমেই বলেছিল, এ পার্টি টাকা দিতে রাজি আছে। ভূদেবরে মুখ আর বলার ভঙ্গি দেখে তবু পঙ্কজ আশা করতে ভরসা পায় নি।

ভূদেবের পরের কথায় জানা গেল যে তার আশঙ্কাই সত্য। ঈশ্বরলাল টাকা দিতে রাজী আছে, কিন্তু কেবল তাদের সর্তে নয় আরও একটা সর্ত সে চাপতে চায়। কাগজের পলিসি সে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই সর্তে আর টাকা নেওয়া যায় কি করে! আজ তিন বছর যে নীতি অনুসরণ করে, তারা দুই বন্ধু প্রাণপণ চেষ্টায় কাগজটা চালিয়ে এসেচে, সেই নীতিই যদি বদল করতে হয়, তার চেয়ে কাগজ বন্ধ করে দেওয়াই ভাল।

তার মুখ দেখে ছোট বোন কল্যাণী একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, টাকার ব্যবস্থা হল না দাদা?

—নাঃ। দেশের স্বার্থের বদলে ওদের স্বার্থ দেখবার পলিসি নিলে টাকা দেবে।

জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করে পঙ্কজ সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, কল্যাণী বলে, বিভাদি একটা চিঠি দিয়ে গাড়ী পাঠিয়েছে দাদা।

পঙ্কজ খাম খুলে চিঠি পড়ে। দুলাইন চিঠি—বিভার বড় বিপদ, পঙ্কজ যেন এখুনি একবার যায়।

—বিভাদি কি লিখেছে?

পঙ্কজ চিঠিখানা তার হাতে দেয়। চিঠি পড়ে কল্যাণী বলে, নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। নইলে এমন ভাবে ডেকে পাঠায়? খোঁড়া মেয়েটার কথা ভবলে এমন কষ্ট হয়!

পঙ্কজ বাইরে গিয়ে বিভার বাবা নগেনের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে?

বিপিন বলে, কিছু তো হয় নি। আমায় চিঠি দিয়ে আপনার কাছে আসতে বললেন। আমি কাগজের অপিস হয়ে আসছি। দিদিমণি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

পঙ্কজ বলে, আজ আমি যেতে পারছি না। দিদিমণিকে গিয়ে বোল, কাল সময় করে যাব।

কল্যাণী যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

—একটা খোঁড়া মেয়ে এমন করে বিপদের কথা লিখে যেতে বলেছে, তুমি যাবে না দাদা?

—কাল গেলেও চলবে। তেমন জরুরী ব্যাপার হলে কি বিপদ, সেটা খুলে লিখত।

—চিঠিতে লেখা যায় না, এমন হতে পারে তো! মেয়েদের কত কি হয়।

পঙ্কজ বোনের মুখের ভাব দেখে একটু হেসে বলে, মেয়েরা আবার সামান্য কারণে পাগলও হয়।

খেয়ে উঠে পঙ্কজ সিগারেট টানে, আর তাদের কাগজটা বাঁচিয়ে রাখার উপায়ের কথা ভাবে। ভূদেবও টাকা দিয়েছে, খেটেছে কাগজটার পেছনে, কিন্তু তার মত প্রাণপাত করে নি। কাগজটা তুলে দেবার কথা ভাবলে জীবনটা যেন শূন্য হয়ে যাবে মনে হয়।

কত মানুষের কত টাকা অকেজো হয়ে পড়ে আছে কিন্তু তার কাগজটা চালু রাখার জন্য কিছু টাকা লাগাতে সবাই নারাজ। বিভার বাবা নগেনরও কত টাকা, খোঁড়া কুৎসিত একটা মেয়ে ছাড়া তার কেউ নেই, কিন্তু কাগজটার জন্য টাকা ধার চাইলে বা কাগজের অংশ কিনে নিতে বললে সে ঘাড় নাড়বে।

ঘুম আসবে না, তবু শুয়ে পড়ার কথা ভাবছে এমন সময় তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বিভা নিজেই এসে হাজির হয়। কষ্টে গাড়ি থেকে নেমে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভেতরে আসে।

—আপনি তো গেলেন না, আমি নিজেই এলাম!

বয়স হবে তেইশ-চব্বিশ, দুটি পায়ের পাতাই তাব দুমড়ানো। মুখখানা লাবণ্যে কমনীয় মনে হতে পারত, কিন্তু অতিরিক্ত কালো রোমের জন্য সব লাবণ্য মাটি হয়ে গেছে।

পঙ্কজ বলে, এতই জরুরী ব্যাপার?

—বিপদে পড়েছি, জরুরী নয়?

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে বিভাদি?

বিভা বলে, তুই পরে শুনিস ভাই। পঙ্কজদার সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করে নিই।

কল্যাণী ভিতরে চলে গেলে বিভা কোনরকম ভূমিকা না করেই সোজাসুজি তার বিপদের কথা পাড়ে। বলে, বাবা আবার আমার

বিয়ের ব্যবস্থা করছে। বাবার অপিসেই কাজ করে, আপনি বোধ হয় চেনেন—নাম হল রমেশ সরকার।

পঙ্কজ বলে, চিনি। ছেলেটির স্বভাব ভাল।

বিভা ফুঁসে ওঠে, ছাই ভাল! টাকার লোভে বড়লোকের খোঁড়া কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, সে আবার ভাল! এদের চেয়ে হীন অমানুষ আর হয়?

রাগ সামলে বিভা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, আপনি আমায় বাঁচান পঙ্কজদা। কালকেই বোধ হয় আশীর্বাদ করতে আসবে।

—নগেনবাবুকে জোর করে বল না তোমার অনিচ্ছার কথা?

বিভা একটু হতাশার হাসি হাসে।

—বলতে বাকী রেখেছি নাকি? রেগে কেঁদে কতরকমভাবে কতবার বলেছি। বাবা আমার সব কথা শোনে, বিয়ের ব্যাপারে শুনবে না। আপনিই তো বল্লেন ছেলেটার স্বভাব ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে শুনতে ভাল—এ সুযোগ বাবা কিছুতেই ছাড়বে না।

একটু থেমে বিভা মুখ বাঁকিয়ে বলে, বাবার কি হয়েছে আমি জানি। বাবার মনে ভয়ানক আতঙ্ক—বয়স হয়েছে, আমি পাছে কিছু করে বসি'। বিয়ে হলে আমার স্বাদ-আহ্লাদও মিটবে, আবার কিছু যদি করেও বসি আসবে যাবে না।

বিভা তীব্র জ্বালাভরা হাসি হাসে।

—ভাল ছেলে কিনে আনবে তবু আমি বিয়ে করতে চাই না, এতে আরও বেশী ভয় হয়েছে বাবার। নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে ভেতরে। আমায় যে বিয়ে করবে, সে টাকার জন্যই করবে, এরকম লোকের কথা ভাবলেও যে আমার ঘেন্না হয়, গা ঘিন ঘিন করে, বাবা এটা বুঝবে না।

পঙ্কজ বলে, কি করে বুঝবেন? উনি তো জানেন টাকার জন্যই

মানুষ সব করে। তুমিও বুঝতে না, কেনা বর পেয়ে খুশীই হতে, কলেজে পড়ে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে তোমার মাথাটা বিগড়ে গেছে।

—শুধু সেজন্য নয়। আপনার কাছে পড়ার জন্যেও। আপনার কাছেই শিখেছি, খোঁড়া হলে কুৎসিত হলেই কারো জীবন ব্যর্থ হয় না, জীবনটা সার্থক করার, সুখী হবার অনেক উপায় আছে।

পঙ্কজ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, শিখেছো অনেক কিছু, শুধু মনের জোরটা শিখতে পার নি। পারলে এরকম পাগলের মত ছুটে আসতে হ'ত না।

বিভা নীরবে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, এই বয়সে তোমার মত মেয়ের বিয়ে জোর করে কোন বাবা দিতে পারে? এদিকে বিয়েটাকে বলছ ভয়ানক বিপদ, বিয়ে হলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে—অথচ সেটা ঠেকাবার জন্য একটু কাঁদা-কাটার বেশী কিছু করতে পার না। বিপদ কঠিন হলে কঠিন ব্যবস্থা করতে হবে না?

বিভা চেয়েই থাকে।

পঙ্কজ সিগারেট ধরায়। বিভা লক্ষ্য করছিল আজ সে ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে।

—বাবাকে জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও যে বিয়ে তুমি কিছুতেই করবে না, মরে গেলেও নয়। সেজন্য যা করা দরকার করতে প্রস্তুত হও।

—কি করব?

পঙ্কজ এবার হাসে।

—এখনও জিজ্ঞেস করছ কি করবে? কত কি করার আছে। কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি কিম্বা

হোটেলে গিয়ে থাকবে। নগেনবাবু যতক্ষণ না কথা দেবেন যে, তোমার বিয়ের চেষ্টা করবেন না, বাড়ি ফিরতে রাজি হবে না।

—ও!

—তুমি সত্যি বিয়ে করবে না, এটা টের পেলে কি আর নগেনবাবু চেষ্টা করবেন? কিন্তু তোমাকেই শক্ত হয়ে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে তো ওঁকে?

বিভা বলে, বুঝেছি। ভাগ্যে আপনার কাছে এসেছিলাম!

ভিতরে গিয়ে বিভা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে। পঙ্কজের মার প্রশ্নের জবাবে জানায় সে খেয়ে এসেছে।

কল্যাণীর কাছে পঙ্কজের কাগজের সমস্যার কথা শুনে আপশোষ করে বলে, ইস্! বাবা যদি একটু কম কৃপণ হত! কাগজটাগজের ব্যাপার বোঝে না কিনা, এদিকে টাকা লাগাতে তাই ভয় পায়।

একটু আনমনা মনে হয় বিভাকে। মেয়েদের খাওয়া হয়ে যাবার পরেও সে উঠবার নাম করে না।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কল্যাণীকে বলে, তুই কোন্ বিছানায় ঘুমাস ভাই?

কল্যাণী তার বিছানা দেখিয়ে দিলে, সে একেবারে শুয়ে পড়ে।

বলে, আমি আজ তোর কাছে ঘুমোবো। ড্রাইভারকে বলে আয় তো গাড়ি নিয়ে চলে যাক। বলিস কালকেও গাড়ি নিয়ে আসবার দরকার নেই।

কল্যাণী খুশী হয়ে বলে, তুমি থাকবে আমাদের বাড়ি? কি ভাগ্যি!

—কার ভাগ্যি সে তুই বুঝবি না!

ঘন্টাখানেক পরে অবশ্য গাড়ি আবার ফিরে আসে, নগেনকে নিয়ে।

অন্ধ ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল, আলো জ্বলছিল শুধু পঙ্কজের ঘরে। সে বাইরে গিয়ে দরজা খুলে নগেনকে ভিতরে আনতে আনতে অন্য ঘরের আলোও জ্বলে ওঠে।

নগেন রেগেছে টের পাওয়া যায়।

পঙ্কজকে সে বলে, কি বুদ্ধি মেয়েটার! কাল সকালে আশীর্বাদ করতে আসবে, আজ রাত্রে ও এখানে থেকে গেল। আবার বলে দিয়েছে, কালকেও গাড়ি আনবার দরকার নেই।

পঙ্কজ বলে, বিভা কল্যাণীর সঙ্গে শুয়েছে। আপনি ওঘরেই চলুন।

কল্যাণী আর বিভা দুজনেই উঠে বসেছিল।

নগেন ভূমিকা না করেই বলে, কাল সকালে আশীর্বাদ হবে, তুই এখানে থেকে গেলি কি রকম?

বিভা বলে, কাল আশীর্বাদ বলেই থেকে গেলাম।

নগেন প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে বলে, পাগলামি কোর না। আমার সঙ্গে ফিরে চলো। তোমার মা ওদিকে উতলা হয়ে আছেন।

বিভা বলে, আমি যাব না। তুমি বুঝতে পারছ না। আমি ছেলেমানুষ নই, ছেলে-মানুষী করেও তোমায় বারণ করি নি। বলছি আমার বিয়েটিয়ে হতে পারে না, আমি মরে গেলেও হতে দেব না, তুমি কিছুতে শুনবে না আমার কথা। অগত্যা কি করি, বাড়িই ছাড়তে হল আমাকে।

নগেন বাক্যহারা হয়ে থাকে।

বিভা বলে, তুমি যদি রাগ করে আমায় ত্যাগ কর, করবে। আমি নিজের ব্যবস্থা করে নেব। আমি গায়ে বিষ্ঠা মাখতে পারব, কিন্তু তোমার কেনা মানুষকে বিয়ে করতে পারব না।

নগেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বিভা বলে, হলে কি করব? আমার মাথা নিয়েই চলতে হবে তো আমাকে।

রাগারাগি করে নরম হয়ে বুঝিয়ে অনেকক্ষণ মেয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে নগেনকে অগত্যা ফিরেই যেতে হয়।

বিভার ঘুম আসে না। কল্যাণীরও নয়।

বিভা বলে, আমার নয় মাথা গরম হয়েছে বুক ধড়ফড় করছে, ঘুম আসছে না, তোর কি হল?

কল্যাণী কাতরভাবে বলে, মাঝ রাতে দাদা ছাতে পায়চারী করছে। কি না করেছে দাদা কাগজটার জন্য। এমন একটা খাঁটি কাগজ, টাকার অভাবে তুলে দিতে হবে।

বিভা বলে, সত্যি। ভাবলেও কষ্ট হয়।

সকালে চা-খাবার সময় পঙ্কজের মুখে রাত-জাগার ছাপটা স্পষ্টই দেখা যায় কিন্তু দুশ্চিন্তার ছাপটা যেন কম মনে হয়।

চা খাওয়া হলে পঙ্কজ বলে, কল্যাণী, তুই একটু ও-ঘরে যা তো, বিভার সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা আছে।

কল্যাণী চলে গেলে পঙ্কজ বলে, আমিও এক বিপদে পড়েছি জান তো? কাগজটা নিয়ে?

বিভা বলে, শুনলাম। ঠিক এই সময়টা বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, নইলে অন্তত চেষ্টা করে দেখতাম!

পঙ্কজ শান্তভাবে বলে, তুমি আমার কাগজটাকে বাঁচাতে পারো।

বিভা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, টাকার জন্যে তোমায় যদি বিয়ে করতে দাও।

বিভার মুখ হাঁ হয়ে যায়। সে কথা বলতে পারে না।

পঙ্কজ বলে তোমার জন্য ঠিক প্রেম হয়তো আমার নেই, কোনদিন কোন মেয়ের জন্য থাকবে বলেও মনে হয় না। তবে তোমাকে আমি স্নেহ করি। এই মমতা তুমি পাবে।

বিভা কাতরভাবে বলে, আপনি আমায় বিয়ে করবেন?

—দোষ কি? তোমার বাবাও খুশি হবেন।

—কিন্তু আপনার যে খোঁড়া-কুচ্ছিত বৌ হবে!

পঙ্কজ বলে, তা হোক না। কাগজটা বাঁচাতে পারলে খোঁড়া বৌয়ে আমার আপত্তি নেই।

বিভা মাথা নত করে থাকে।

পঙ্কজ ধীরে ধীরে বলে, তবে একটা খুব গুরুতর কথা আছে। আমার ওপরে তোমার ঘেন্না জন্মাবে কি না।

বিভা মাথা তুলে বলে, না। টাকার লোভ তো আপনার নয়, কাগজটার জন্য, আদর্শের জন্য। আমার বরং—

কথাটা তার গলার আটকে যায়।

—তোমার বরং?

—আমার বরং ভক্তিই বেড়ে যাবে।

বিভা একটু হাসে।

সুবালা

ভোরে অঘোরদের বাড়ী দুধ আনতে গিয়ে রোজই পঙ্কজ বৌটিকে দেখতে পায়। অঘোরদের বাড়তি ফেলনা ছোট চালা ঘরটা কিছু দিন হল ভাড়া নিয়েছে—দু মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে। কোলে একটি বছরখানেকের ছেলে। সঙ্গে থাকে কেবল বুড়ি দিদিমা।

বুড়িকে প্রথমদিন দেখে পঙ্কজ শিউরে উঠেছিল। খড়িতোলা কালচে লোল চামড়ায় ঢাকা একটা যেন কঙ্কাল, বয়সের ভারে সে জীবন্ত কঙ্কালটা আবার বাঁকা হয়ে গেছে। মাথায় ধোঁয়াটে রঙের জট, ছানি পড়া চোখ। এই বয়সে এই দেহের ভার বয়ে সে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে নতুন আস্তানার খোঁজে! হয়তো এই যুবতী নাতনিটার জন্য অথবা যে কটা দিন বেঁচে থাকবে সেখানে তাকে দেখবার কেউ নেই বলে।

সুবালা সায় দিয়ে বলে, হ। আত্মীয়-কুটুম যাগো ভরসায় ছিলাম, তারা পলাইয়া আইবো, আমরাও লগে আইলাম। করুম কি।

নদীর দেশের মেয়ে, সুবালার গায়ের মেটে রঙটা যেন পলি পড়া নদীর বুকের ভিজা চরের মত সরস আর মসৃণ। লাবণ্য যেন চোখ জুড়িয়ে দেয়। গরীবের মেয়ে গরীবের বৌয়ের দেহে এ লাবণ্য কোথা থেকে আসে, কিসে সম্ভব হয়, পঙ্কজ তা জানে। সেও ওই নদীর দেশেরই মানুষ।

সারা বছর ভাত হয়তো জুটত না পেট ভরে। কিন্তু পাড়-ঘেঁষা নদীর জলে খালে ডোবায় মেয়েরাও কুঁড়ো জালে ধরতে পারত কুচো

মাছ, অনেক রকম জলচর জীবের ছানা আর কাউটা কাছিমের ডিম। বিষহীন মোটা মোটা জলের সাপ একটা দুটো। পেঁয়াজ আর খানিকটা লঙ্কাবাটা দিয়ে রাঁধলে মাছ মাংসের শোক ভোলা যেত। কলমী পলাশ কচু ইত্যাদি অনেক রকম শাকপাতা যতখুসী কুড়িয়ে আনলেই চলত। ঘরের চালায় ফলত লাউ কুমড়া। বিনা পয়সায় কিম্বা সামান্য দামে মিলত কয়েক রকম ফল।

দু'এক মুঠো চাল যোগাড় হলেই চালিয়ে নেওয়া যেত পুরানো আদিম উপায়ে শরীর পোষণ।

একখানা পুরানো শাড়ী আলগা করে গায়ে জড়ানো থাকে। ছেলেকে মাই দিয়ে দাওয়ায় শুইয়ে ঘর ঝাঁট দেয়, গামছা পরে বাসন নিয়ে ঘাটে যায়, গা ধুয়ে বালতি আর মেটে কলসীতে জল আনে দু'তিন দফায়।

একটু কম মনে হয় তার লজ্জাবোধ।

দু'তিন জন মানুষ দুধ নিতে এসে দাঁড়িয়েছে, দুধ দুইতে দুইতে অঘোর তার দিকে তাকাচ্ছে, এটা যেন সে খেয়ালও করে না। খেয়াল করলেও বোধ হয় গ্রাহ্য করে না।

পঙ্কজ জানে, গ্রাম কেন, সহরতলীতেও যে সব এলাকায় মেয়েদের খোলা ডোবা পুকুরই একমাত্রঅবলম্বন, সহরের মেয়েদের মত শ্লীলতা বজায় রেখে চলা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়, সেটা নিয়মও নয়। অবস্থার সঙ্গে মানিয়েই তো চালচলন হবে মানুষের। কিন্তু এই বয়সে এতটা শিথিলতাও আবার নিয়ম নয়। ডুমুরের মত দুতিনটি ছেলেমেয়ে হলে, বয়স আর একটু বেশী হলে, আশেপাশে চালা ঘরগুলির পুরানো বাসিন্দা ও উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সুবালার চালচলনও চমৎকার মানিয়ে যেত।

ছেলে কোলে সুবালা দাওয়ায় বসলে তার পাকা গিন্নি পাকা মায়ের

মত বসার ভঙ্গি দেখে দেখে, মুখের উদাস নির্ব্বিকার ভাব দেখে, পঙ্কজের অস্বস্তি কেটে যায়।

অঘোরের দুধ দোওয়া আর ডুমুরের পোয়া পোয়া দুধ মেপে দেওয়া দেখতে দেখতে সে হয় তো জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে ভাবছে, ছেলেটার জন্য এক ফোঁটা দুধ কিনতে পারলে ভাল হত।

দুধ দোয় অঘোর, দুধ মেপে দেয় তার বৌ ডুমুর।

অঘোরকে সে একেবারেই বিশ্বাস করে না। এক টাকা সের সামনে দোয়া দুধ, শ্যামবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সে মাপার কায়দায় তাকে একপো দেড়পো করে দুধ বেশী দিয়ে দিত। মাসে দশ বার টাকার দুধ বেশী দিয়ে খুশী থাকত চার পাঁচটা টাকা পেয়ে। যা পায় তাই তার লাভ!

কে জানে অন্য বাবুদের সঙ্গেও এরকম বন্দোবস্ত ছিল কি না। টের পাবার পর ডুমুর আজকাল দুধ দোয়ার সময় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, নিজে দুধ মাপে। যে মদ্দ মানুষ বৌয়ের ঘাড়ে খায় আর চোরাবাজারী একটা বজ্জাত লোকের ফুট্ ফরমাস খেটে হাত খরচার পয়সা কামায়, এমনি নেমকহারামই সে বোধহয় হয়।

ভদ্দরলোকদেরও বলিহারি যাই, ডমুর বলে ঝংকার দিয়ে, সোয়ামীকে দিয়ে ইস্তিরির ঘরে চুরি করতে পিবিত্তিও হয়।

অঘোরের সামনেই সে বলে।

অঘোর কখনো মুখ বাঁকায়, কখনো মুচকে একটু হাসে।

তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ আর রাঁধাবাড়া সেরে মুখে দুটি গুঁজে ছেলে কোলে কোথায় যেন চলে যায় সুবালা সারাদিনের মত। বুড়ি দিদিমা একলাই ঘরে পড়ে থাকে।

পঙ্কজ আজ তাড়াতাড়ি বার হয়েছিল, পথে একটা কাজ সেরে আপিস যাবে।

সুবালাও ছেলে কোলে বাসের জন্য কাছে এসে দাঁড়ায়।

কই যাইবা ?

কামে যাবু। কাম না করলে খামু কি ?

সেই শাড়ীখানাই তেমনি আলগা করে পরা, বোধ হয় আর কাপড় নেই। পথে বার হবার জন্য সীঁথিতে সে বেশী করে সিদুঁর দিয়েছে, কপালে স্পষ্ট করে বড় ফোঁটা এঁকেছে।

পঙ্কজ সহানুভূতির সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, তাতো বটেই। তোমার সোয়ামী কই ?

সুবালা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কে জানে উপায়ের ধান্ধায় কোন্ চুলায় গেছে।

খানিক চুপ করে থেকে বাস আসছে দেখে পঙ্কজ হঠাৎ প্রশ্ন করে তুমি কি কাম কর ?

সুবালা বলে, করি এটা ওটা যা পাই।

টের পাওয়া যায়, কি কাজ করে স্পষ্ট জানাতে সে নারাজ।

পূরো অপিস টাইমের মত ভিড না হলেও বাসে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। পঙ্কজকেও দাঁড়াতে হয়। সুবালা বসে লেডিজ সিটে।

বসে পঙ্কজকে চমৎকৃত করে দিয়ে বুকের কাপড় সরিয়ে ছেলের মুখে মাই গুঁজে দেয়। গাড়ী বোঝাই পুরুষের মধ্যে নয়, সে যেন বসে আছে নির্জন ঘরের কোণে, এমনি সহজ নির্বিকারভাবে মুখ তুলে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বুঝতে পারে এটা তার পুরুষদের তুচ্ছ করা, অবজ্ঞা করা নয়। এতগুলি পুরুষের দৃষ্টিপাত তার কাছে অতি সহজ স্বাভাবিক

ব্যাপার, সূর্য যেমন বাসের জানালা দিয়ে তার গায়ে রোদ ফেলছে আলো ফেলছে, তেমনি সাধারণ ব্যাপার—এজন্য বিব্রত বা বিচলিত হবার কোনও কারণ তার নেই।

বুক ফুলে ওঠে পঙ্কজের। এতো গেঁয়োমি, অসভ্যতা বা অশ্লীলতা নয়, এ যে বিদ্রোহ! তার দেশের এই কচি মা-টি যেন ইংরেজী মার্কিনী নোংরামি ও অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে বাস্তব কার্য্যকরী প্রতিবাদ—বিদ্রোহের একটি জীবন্ত প্রতীক।

তোমরা সিনেমায় পারো, রং-বেরং সখের পত্রিকায় পারো, গোপন পুস্তিকা, গোপন ফটোতে পারো—দাম নিতে পারো, স্বার্থের খাতিরে পারো।

আমি মা এই চিন্তায় নিজের যৌবন ভুলে গিয়ে সন্তান গায়ের রক্ত জল করা মধু পান করানোর প্রয়োজন পারো কি, এমন সহজ স্বাভাবিক জোরের সঙ্গে তেজের সঙ্গে?

সুবালা কি কাজ করে সেদিনই যে নিজের চোখে দেখে জেনে যাবে পঙ্কজ কল্পনাও করে নি।

নিজের কাজে সে নেমে যায় আগেই। কাজ সেরে আবার বাসে উঠে যেতে যেতে বড় একটা চৌমাথার কাছে বাস দাঁড়ালে সে দেখতে পায় পাশের রাস্তায় চৌমাথার কিছু তফাতে ফুটপাতে বসে গামছা বিছিয়ে ছেলেকে সামনে ধরে সুবালা ভিক্ষা করছে।

পথে ঘাটে দেখা হলে বাড়ীতে এলে আশে পাশের মেয়েরাও জানতে চায় সারাদিন সুবালা কোথয়ে থাকে, কি করে। কিভাবে সে দিন চালাচ্ছে জানবার জন্য উদ্বাস্তু অসহায়া মেয়েদের দেখা যায় আরও বেশী কৌতূহল।

রুগ্ন স্বামী আর তিনটি বাচ্ছা নিয়ে বিব্রত ইছামতী প্রায় ধন্না দেয় তার কাছে।

বলে, চাউল আইনা বেইচা পারিনা আর টানতে। আনার খরচ, ঘুষ—মাঝে মাঝে চাউল কাইড়াও লয়। আমারে কইয়া দে—তুই যা করস আমিও তাই করুম।

সুবালা বলে, তুমি পারবা না দিদি, তাছাড়া আমার কামে লাভও বেশী নাই।

ইছামতী বাঁকা চোখে তাকায়।—পারুম না ক্যান? লাভ হইব না ক্যান? বয়স নাই চেহারা নাই বইলা?

সুবালা দুঃখের হাসি হাসে।—দ্যাখো না সারাডা দিন বাইরে কাটাই? সোয়ামীর ফেইলা পোলাপানগো ফেইলা তুমি পারবা? আমি ভিক্ষা করি, গতর খাটাই, যেমন সুবিধা। তুমি যা নিয়া আছ তাই নিয়া থাক।

ডমুরও কৌতূহল প্রকাশ করে। বলে, সত্যি, কোথায় যাও, কি কর সারাটা দিন? আমায় বললে দোষ নেই। মেয়েছেলে বিপাকে পড়েছ, যে ভাবে পার রোজগার করবে—বাছ বিচার থাকলে চলবে কেন? তুমি বদ কাজ কর জানলেও আমি তোমার নিন্দা করব না ভাই।

বলে, বে-রোজগেরে পুরুষগুলি পাজীর একশেষ। নইলে এমনভাবে তোমার দায় এড়িয়ে পালায়!

সুবালা বলে, সে ক্যান পালাইবো? পলাইয়া আইছি তো আমি! কাম নাই উপায় নাই, মাথা গেছে খারাপ হইয়া—যত চোট আমার উপরে। তুমি তো দিদি সুখেই আছ, সোয়ামী কত খাতির কইরা মন যোগাইয়া চলে।

ডুমুর বলে, খেতে পরতে দিচ্ছি, খাতির করবে না, মন যোগাবে না?

সুবালা মাথা নাড়ে। আমিও খাওয়াইতাম ভিক্ষা কইরা। জ্বালা—জ্যান বেশি হইত, পুরুষ হইয়া আমার রোজগার খাইব! আরও বেশী ঝাল ঝাড়ত আমার উপরে।

ডুমুর একটু আশ্চর্য্য হয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, অ! মানুষটা তবে অভিমানী? সেটা খারাপ নয়। অবস্থা পাল্টালেই এসব মানুষের মাথা আবার ঠিক হয়ে যায়।

মুখ বাঁকিয়ে বলে, পা-চাটা নরম চোর ছ্যাঁচোরের চেয়ে তো ভাল!

তারপর একদিন যথারীতি সকাল বেলা ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সুবালা অসময়ে দুপুরবেলা ফিরে আসে। দেখা যায়, কোলে তার ছেলে নেই, মুখ থম্ থম্ করছে।

ডুমুর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হল? ছেলে কই?

নিয়া গেছে।

নিয়া গেছে? কে নিয়ে গেল?

যার ছেলে সে-ই নিছে।

না, হরেন গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে যায় নি। সুবালা কি তা হলে ছেড়ে কথা কইত? এতদিন সহরের পথে পথে ঘুরছে সে কি আর জানে না মেয়েদের জোর কিসে? চেঁচিয়ে লোক জড়ো করলে ছেলে কেড়ে নিয়ে পালাবার সাধ্য আর হত না হরেনের। হয়তো থানা পুলিশ হত, সে তো পরের কথা।

বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ হঠাৎ কোথা থেকে হরেন এসে হাজির। শান্তভাবে নরম ভাবে কথা বলছিল, ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছিল। তারপর বলছিল যে এই দুপুর রোদে ছেলেটা ফুটপাতেই পড়ে রয়েছে, ওর গলা শুকিয়ে গেছে বোধ হয়। কাছের ওই খাবারের দোকান থেকে একটু দুধ খাইয়ে আনবে।

ডুমুর বলে, বোকা মেয়ে, সঙ্গে গেলে না?

সুবালা বলে, গেলাম না?

সুবালা বলে, গেলাম তো।

দুধ খাওয়াবে বলেই ছেলেকে নিয়ে হরেন চলতে আরম্ভ করেছিল, কাপডটা গুটিয়ে পয়সাগুলি আঁচলে বেঁধে নিতে একটু পিছিয়ে পডেছিল সুবালা। তার কি ধারণা ছিল হরেনের কি মতলব।

কোন গলিতে ঢুকে কোন দিক দিয়ে কোথায় যে চলে গেল হরেন! পাগলিনীর মত চারিদিকে ছুটাছুটি করে লোককে জিজ্ঞাসা করে কোন আর হদিস পেল না সুবালা।

বুড়ী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করে, পোলারে কই থুইয়া আইসি?

কাণের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে কথা না কইলে সে বুঝতে পারে না। সুবালা ছেলের খবর জানাতেই সে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে সুরু করে।

সুবালা আবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে বলে, পোলা মরছে নাকি যে কাঁদ? বাপের লগে পোলা গেছে, কাঁদনের কি? অমঙ্গল ডাইকা আইনো না কইলাম!

দেখা যায়, সুবালা আজ কাঁধে ফেলে রাখার বদলে আঁচল গায়ে জড়িয়েছে। বোধহয় শূন্য বুক ঢাকবার জন্য।

কয়েকটা দিন আশায় আশায় সুবালা বার হয়, সেইখানে গিয়ে ফুটপাতে কাপড বিছিয়ে বসে থাকে—যদি মানুষটা ফিরিয়ে এনে দেয় ছেলেকে।

এখনো মাই খায় ছেলে। আজ পর্য্যন্ত একদিন মাকে ছেড়ে থাকে নি। মার জন্য নিশ্চয় সে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদবে! অতটুকু শিশুর কান্না, নিজের ছেলের কান্না কি সহ্য হবে হরেনের?

সহ্য হবে কি অতটুকু বাচ্চাকে সারাদিন সামলে চলার ঝন্‌ঝাট?

ডুমুর বলে, পাগল হয়েছ? তাই কখনো পারে? বড়জোর একদিন কি দু'দিন। বাপ বাপ বলে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে।

সারাদিন রাস্তায় অসংখ্য মানুষ চলাচল করে হরেনের জন্য চোখ

কান পেতে রাখে সুবালা। দু'এক পয়সা ভিক্ষে তাকে কে দিচ্ছে না দিচ্ছে, গায়ে পড়ে ভাব করতে চেয়ে কে কি বলছে না বলছে, কোন দিকেই তার মন যায় না।

দিন দশেক পরে হতাশ হয়ে সে বেরোনো বন্ধ করে।

বলে, তবে আর ক্যান ভিক্ষা করুম? এবার থনে গতর খাটাই।

পঙ্কজের স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে। আর দু'একমাস পরে সে একটি রাঁধুনি রাখার কথা ভাবছিল। সুবালা কাজ খুঁজছে শুনে সে তাকে অবিলম্বে বহাল করতে চায়।

সুবালা বলে, আপনারা বেরাহ্মন, নীচ জাতের রান্না খাইবেন?

পঙ্কজ বলে, রাখো তোমার জাত। কত সুখে আছি, তার আবার জাত বিচার!

সুবালা দু'বেলা পঙ্কজের বাড়ী রেঁধে দিয়ে আসে, নিজে ওখানেই খায়। বুড়ী দিদিমার বয়সের কঠিন রোগ, বয়স ঠেকিয়ে ওর বেঁচে থাকার পথ্য তৈরী করে দেওয়ার কোনো হাঙ্গামাই নেই। জল ছাড়া প্রায় কিছুই সহ্য হয় না বুড়ীর।

সুবালা ডুমুরকে বলে, আমি ঠিক শোধ নিমু। অন্যেরে দিয়া এই প্যাটে পোলা জমাইয়া কোলে করুম।

ডুমুর বলে, একশো বার—করিস না কেন? কারো সঙ্গে থাক না—সতীশ, নকুল আরো কটা মানুষ তো ওৎ পেতে বসে আছে। একজনের সঙ্গে ভিড়ে যা, খেটে খেতে হবে না তোকে।

সুবালা বলে, থাকুম—বুড়ীটা মরুক? আরও কাহিল হইয়া পড়ছে, এই জল হাওয়া সয় না। আর কয়দিন? বুড়ী চোখ বুজলেই পুরুষ নিয়া থাকুম।

তার পর আবার একদিন আচমকা হরেন এসে হাজির হয়

ডুমুরের বাড়ীতে। ছেলেকে উঠানে নামিয়ে দিয়ে বলে, সুবালা নাই ?

না।

গেছে কই ?

তার গায়ের নতুন সার্ট, পরণের ফরসা ধুতি দেখে ডুমুর হেসে ফেলে। অজানা অচেনা মানুষটা সম্পর্কে তার ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হয় নি। অবস্থা একটু বদলাতেই, কোন রকমে দুটো পয়সা উপায়ের ব্যবস্থা হতেই, মন মেজাজ বদলে গেছে মানুষটার। বৌয়ের আস্তানা খুঁজে বার করে নিজেই হাজির হয়েছে ছেলেকে কোলে নিয়ে !

তার হাসি দেখে ভড়কে গিয়ে হরেন শুধোয়, সুবালা থাকে না এখানে ?

ডুমুর বলে, না। সুবালা ওদিকে সতীশ দাসের ঘরে থাকে।

হরেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ডুমুর জিজ্ঞাসা করে, আপনি কে হন সুবালার ?

হরেন জবাব দেয় না।

তখন ডুমুর বলে, আপনাকে চিনেছি, তাই একটু তামাসা করলাম। সুবালা আছে।

দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়ে বলে, বসুন, সুবালাকে ডেকে আনছি। সুবালা এক ভদ্দরলোকের বাড়ী রান্না করে।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই ডুমুর সুবালাকে ডাকতে যায়।

একলা ফিরে এসে বলে, সুবালা আসছে।

বেলা তখন প্রায় ন'টা। সুবালা আসে না কিন্তু ঘরে যেন বোনের জামাই এসেছে এমনিভাবে হরেনকে ডুমুর সমাদর করে—অঘোরকে দিয়ে খাবার আনিয়ে চা আনিয়ে খাওয়ায়।

বলে, আপনাকে ঠেঙ্গানো উচিত কিন্তু কি করি। মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার ওপরে।

দু'ঘণ্টা পরে পঙ্কজের বাড়ী রান্না খাওয়ার পাট সাঙ্গ করে সুবালা ফিরে আসে।

অঘোর বেরিয়ে গিয়েছিল। ডুমুর বলে, আমিও একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি! তোমাদের বোঝাপড়া হোক।

সেমিজের ওপর ডুমুর কোড়া শাড়ী পড়েছে। সিঁথিতে বা কপালে তার সিঁদুর নেই।

ছেলেকে কোলে নিয়ে সে চুপ-চাপ সামনে বসে থাকে।

হরেন কাতর ভাবে বলে, ওকে একটু মাই দাও।

ধীরে ধীরে সেমিজের বোতাম খুলে সুবালা ছেলের মুখে মাই তুলে দেয়। মাই টানবার চেষ্টা করতে করতে মুখ বাঁকিয়ে বাচ্চাটা একবার কেঁদে ওঠে, তারপর আবার মাই খাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কচি দাঁতে প্রাণপণে কামড় বসিয়ে দেয়।

সুবালা বলে, উঃ!

আবার সে ধীরে ধীরে সেমিজের বোতাম এঁটে দেয়।

তার স্তনের দুধ শুবিয়ে গেছে।

হরেন নিজে থেকেই তার কৈফিয়ৎ দেয়, বলে, পোলারে নিয়া তুমি ভিখ্ মাগবা আমি সইতে পারি নাই।

সুবালা ধীরে ধীরে বলে, ভিখ না মাগলে পোলারে বা আমারে বাঁচা দেখতা না।

হরেন বলে, তা বুঝি না? তবু গাও য্যান জ্বইলা যাইত। কিন্তু পোলারে নিয়া গিয়া কি ফ্যাসাদে পড়লাম কি কমু তোমারে। রাঙামাসী মাই দিল কয়দিন—

অ! রাঙামাসী মাই দিছে!

কয়দিন মাই দিয়া কয় কি, আমি পারুম না। আমার মাইয়ারে মাইরা তোমার পোলারে দুধ দিতে পারুম না। আমারে মাছ ভাত খাওয়ায় পেট ভইরা তবে পারুম। আমি মানুষ না, ছাগি খাইয়া দুইটারে মাই দিমু? তারপর সেইখানে তোমারে খুঁজতে গেছিলাম।

গেছিলা?

হ। দিন পনর বাদে রাঙামাসী যখন বিগড়াইয়া গেল। তোমারে পাই না, কি বিপদ। মরিয়া হইয়া কিছু পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা করলাম।

তার সার্ট আর ধুতির দিকে চেয়ে সুবালা জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যবস্থা করলা?

হরেন বলে, কইলকাতায় কত উপায় পয়সা রোজগারের। আমরা ক্যান যে বোকার মত ভিক্ষা করছি আর খয়রাত চাইছি।

ওইটুকু চালার মধ্যেই দীর্ঘকাল পরে ছেলেকে পাশে নিয়ে তারা পাশাপাশি শোয়। বুড়ির ঘরের কোণে পড়ে থাকা না থাকা সমান কথা, চোখেও ছাখে না, কানেও শোনে না।

মাঝ রাত্রে পুলিশ হানা দিয়ে হরেনকে ধরে নিয়ে যায়। সহরে অজস্র সম্পদ থাক, অন্যের টাকা ছিনিয়ে নিয়ে নতুন সার্ট আর ফর্সা ধুতি পরতে চাইলে চলবে কেন!

অনেক খোঁজাখুঁজি এবং হরেনকে মারপিট করেও টাকাগুলি কিন্তু পুলিশ পায় না।

পুলিশ হাত কড়া দিয়ে তাকে নিয়ে যায়। যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে হরেন বলে, ভিখ মাইগো না। আমাগো অপরাধ নাই, ভিখ মাইগা অপরাধী সাইজো না। তার চেয়ে মরণ ভাল।

অসহযোগী

রমেনের বাবা হর্ষনাথ ধনেশগঞ্জের মস্ত আড়তদার।

বছরখানেক আগে রমেনকে সে তার পিসতুতো ভগ্নীপতি সূর্য্যপদর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছিল—ছেলেটাকে একটু শান্তশিষ্ট ভদ্র বানাবার আশায়। রমেন একেবারে মারাত্মক রকম দুরন্ত হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই সে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। দু'তিনবার কোর্টে পর্য্যন্ত তাকে দৌড়তে হয়েছিল ছেলের জন্য। শেষে রমেন যখন একদিন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বসুর ছেলেকে মেরে রক্তারক্তি করে দিল, তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এ ছেলেকে সামলে চলা তার সামর্থ্য নয়। এ ছেলে তার সর্ব্বনাশ করবে। যুদ্ধের বাজারে কতভাবে কত কামাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চটালে রক্ষা আছে!

দামী দামী ভেট নিয়ে তিনি সটান গিয়ে হাজির হল একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরে বাড়িতে, মার-খাওয়া ছেলেটির জন্যই উপহার রইল দু'শো টাকার। লুটিয়ে পড়ল মিসেস্ বসুর পায়ের তলে, প্রার্থনা করল রমেনের নিস্তার। ছেলের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবে আগেই ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল, তাই বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিল যে, ভয় পেয়ে রমেন কোথায় পালিয়ে গেছে, ফিরে এলে খুঁটিতে বেঁধে তাকে চাবকে লাল করে দেবে।

সেইদিনই রমেনকে নিয়ে সে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেল, ছেলেকে সূর্য্যপদর জিম্মা করে দেবার জন্য।

রমেনের মা একটু আপত্তি করেছিল!

'উনি স্বদেশী-টদেশী করেন শুনেছি, খোকাকে আবার না বিগড়ে দেন।'

হর্ষনাথ বলেছিল, 'স্বদেশী না ছাই! জেলে যেত না স্বদেশী করলে? ওসব টাকা উপায়ের ফিকির। ছেলেদের নিয়ে দলটল সমিতি-টমিতি করে চাঁদা তুলবার জন্যে। মাস্টারিতে কি কারও পেট চলে?'

শহরতলিতে সূর্য্যপদর বাড়ি। এক রাত্রির বেশী হর্ষনাথ থাকতে পারে নি। তার কত কাজ ধনেশগঞ্জে। সূর্য্যপদকে সব জানিয়ে অনুরোধ করেছিলে, 'ছেলেটাকে তোমার মানুষ করে দিতে হবে ভাই। শুধরে দিতে হবে।'

সূর্য্যপদ হেসে বলেছিলেন, 'দেব। ছেলেকে তোমার মানুষ করে দেব।'

একটা সর্ত করেছিল সূর্য্যপদ যে, এক বছরের মধ্যে রমেনকে ধনেশগঞ্জে নেওয়া চলবে না আর সোজাসুজি রমেনকে টাকা পাঠানো চলবে না। হর্ষনাথ রাজি হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

রমেনের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলে সূর্য্যপদ মোটে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল।

বলেছিল, 'আমি গরিব মাস্টার, তোমার ছেলের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু পঁচিশ টাকার বেশি খরচ ওর লাগবে না।'

পরের মাসে হর্ষনাথ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিল। কয়েকদিন পরে পঁচিশ টাকা ফেরত আসায় খুশি হয়ে রমেনের মাকে বলেছিল, 'না, লোকটা সত্যি ভালো। ছেলেটাকে শুধরে দিতে পারবে বলে মনে হয়।'

একবছর পরে পূজোর ছুটিতে রমেন বাড়ি এল।

তার পরিবর্ত্তন দেখে প্রথম ক'দিন হর্ষনাথ পরম খুশি। যেমন চেহারায় কথায় ব্যবহারেও তেমনি সে শান্তশিষ্ট-ভদ্র হয়ে এসেছে। উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা কিন্তু তাও আঁচড়ানো, জামা-কাপড় সস্তা-দামের কিন্তু দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মুখখানা

হাসিখুশি, কথা মিষ্টি, চালচলন নম্র। গুণ্ডার মত চেহার নিয়ে সারাদিন সে টো টো করে ঘুরে বেড়াত, খেলা আর মারামারি নিয়ে মেতে থাকত এমনি সে চঞ্চল ছিল এক বছর আগে, অকাজের পর অকাজ না করলে তার স্বস্তি ছিল না। একটা কথা কোনদিন সে কারো শুনত না। সে চাপল্য, শয়তানী আর অবাধ্যতা কোথায় উড়ে গেছে!

সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এই যা একটু দোষ। কিন্তু কোন অপকর্ম্মের খবর না পেয়ে এবং বাড়ি ফিরলে ছেলের দেহে বা কাপড জামায় দুরন্তপনার চিহ্ন না দেখে হর্ষনাথ নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে এত দিন পরে দেশে এসেছে, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে হয় তো আড্ডা দিচ্ছে সাধ মিটিয়ে। ওতে আর কি আসে যায়?

দিন সাতেক পরেই কিন্তু মনে তাঁর খটকা লাগে!

আড়ত থেকে ভাত খেতে বাড়ি ফিরে ছাখে কি, শ'তিনেক দুর্ভিক্ষের কাঙালি মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো বাড়ির পাশে ফাঁকা বটগাছ তলায় পাত পেতে ভাত খাচ্ছে, পরিবেশন করছে রমেন আর তারই বয়সী পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলে।

দেখে মুখ হাঁ হয়ে যায় হর্ষনাথের।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে ধপাশ করে বসে পড়ে ছেলেকে সে ডেকে পাঠায়।

'এসব কি হচ্ছে?'

রমেন তখন উৎসাহে ফুটছে।—'ওদের খাওয়াচ্ছি বাবা! কত হিসেব করে খাওয়াতে হচ্ছে জানো? কদ্দিন ধরে খায় না, বেশী খেলেই মরবে। তা কি বোঝে ব্যাটারা? সবাই চেঁচাচ্ছে—আরো দাও, আরো দাও! সামলানো দায়।'

'চাল ডাল সব পেলি কোথা?'

'মা দিয়েছে।'

রমেনের মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আহা আব্দার ধরেছে, খাওয়াক না। সবাই আশীর্ব্বাদ করছে। ভাল হবে।'

'ভাল হওয়াচ্ছি।'

বাড়ির ভাঁড়ারটাই প্রায় ছোটখাট একটি গুদাম ঘর। আগে হর্ষনাথ রমেনের মার কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি সংগ্রহ করলেন। তারপর বটতলার খাওয়া শেষ হলে সকলকে হাঁকিয়ে দিলেন।

আঁধার নেমে এল রমেনের মুখে। সে বলল, 'আমি ওদের সাতদিন রোজ খাওয়াব কথা বলেছি বাবা। তারপর ওরা গাঁয়ে ফিরে যাবে।'

'চুপ কর্, বেয়াদপ কোথাকার! সাতদিন ধরে খাওয়াবে! আমাকে ফতুর করার মতলব!'

দিন যায়। প্রতিদিন চারিদিকে অসহায় ক্ষুধিতের কান্না হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে। রমেন আর হাসে না। খেতে বসে ভাত ছড়িয়ে উঠে যায়। সর পড়ে থাকে দুধের বাটিতে, সন্দেশ পিঁপড়েয় খায়।

হর্ষনাথ রাগ করে বলে, 'কি জ্বালা বাপু! কেন হয়েছে কি?'

'সবাই না খেয়ে মরে যাবে, তুমি কিছু করবে না বাবা?'

'দিলাম যে কুড়িমণ চাল রিলিফে?'

'কুড়ি মণ! তোমার আড়তে হাজার হাজার মণ চাল রয়েছে। সবাই ছি ছি করছে বাবা। সবাই আমায় ঘেন্না করছে তোমার ছেলে বলে।'

'চুপ কর্! বেয়াদব কোথাকার!'

দুদিন রমেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রমেনের মা কেঁদে-কেটে অস্থির হয়। মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হলেও হর্ষনাথ বাইরে মুখ গম্ভীর করে থাকে। রাগে ভয়ে দুশ্চিন্তায় তাঁর মেজাজটা যায় বিগড়ে। ভাবে, রমেন ফিরলে মেরে তাকে আস্ত রাখবে না। দুদিন পরে রমেন ফিরলে তার চোখের চাউনি দেখে দুটো ধমক দিতেও

কিন্তু তাঁর সাহস হয় না। কেমন এক খাপছাড়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে রমেন আজকাল তাঁর দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছিল, দেখে তাঁর কেমন ভয় ভয় করে।

'কোথা গিয়েছিলি না বলে?'

'অনাথবাবুর সঙ্গে সাতগাঁয়ে।'

অনাথবাবুর সঙ্গে! তার পরম শত্রু অনাথবাবু, এই সেদিন যার জন্য প্রায় হাজার মণ চাল গুদামে তোলার বদলে বাঁধা দামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে তাকে!

রমেন আবেদন আর আব্দারের সুরে বলে, 'কি অবস্থা হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। তুমি এক কাজ কর বাবা। যে দামে কিনেছিলে, এক টাকা লাভ রেখে চাল বেচে দাও। তোমার তো লোকসান হবে না, কত লোক বাঁচবে ভাব দিকি!'

'লোকসান হবে না, না? চল্লিশ টাকার জায়গায় চোদ্দ টাকায় বেচলে লোকসান হবে না, কি হিসেব তুই শিখেছিস্?' কথাটা হর্ষনাথ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

তখন রমেন বলে, 'তা হলে তোমার সব চাল আমি বিলিয়ে দেব, বাবা। আগে থেকে বলে রাখলাম। তোমায় আমি মানুষ খুন করতে দেব না।'

'ছোট মুখে বড় কথা বলিসনি, থাবড়া খাবি।'

'বলে রাখলাম। দেখো।'

ছেলেমানুষের হাল্‌কা কথা, কে তা মনে রাখে? আড়তে তার কত লোকজন, গুদোম তালাবন্ধ, চাইলেই কি আর চাল বিলিয়ে দিতে পারবে রমেন—পঞ্চাশজন বন্ধু আর অনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এলেও নয়।

সেজন্য হর্ষনাথের ভাবনা হল না। ছেলের পাগলামি দেখে মনটা শুধু খারাপ হয়ে গেল। কি কুক্ষণেই ছেলেকে মানুষ হতে পাঠিয়েছিল

সূর্য্যপদর কাছে! এর চেয়ে ছেলেটা শয়তান-গুণ্ডা থাকাও ভাল ছিল —বয়স বাড়লে আপনি শুধরে যেত।

দিন কতক পরে হর্ষনাথ ব্যবসার কাজে তিন দিনের জন্য বাইরে গেল। আড়তে বলে গেল, রমেন এসে গোলমাল করলে যেন ভালভাবে শাসন করে দেওয়া হয় আর অনাথ এসে হাঙ্গামা করলে যেন সোজা পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। একবার থানাটাও ঘুরে গেল, অনাথ কি ভাবে তার ছেলের মাথা বিগড়ে দেবার চেষ্টা করছে জানিয়ে দেবার জন্য।

পরদিন সকালে আড়তে ও আড়তের সামনে হৈ হৈ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। নিতাইচরণ আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী, বাবু নেই বলে আড়ত খুলতে লোক পাঠিয়ে নিজে একটু বেলা করে হেলতে দুলতে এসে দ্যাখে কি, প্রায় শ'পাঁচেক লোক জমা হয়েছে আড়তের সামনে। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে নিতাইচরণের চক্ষুস্থির! আড়তের যে কোনে হাজার টিন তেল ছিল পরশু পর্য্যন্ত, সেখানে মেঝেতে তেল আর ময়লার পুরু পাঁকের ওপরেই আড়তের সবাই বসে আছে। তফাতে হর্ষনাথের দু'নলা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রমেন। রমেনের সমবয়সী ছেলেতে আড়ত বোঝাই।

'আসুন নিতাই কাকা। গুদোমের চাবিটা দিন তো।'

'চাবি? চাবি কোথা পাব? চাবি তোমার বাবার কাছে।'

'তা হলে ওখানে গিয়ে বসুন। দরজা ভাঙ্গতে হবে।'

রমেনের এক বন্ধু তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তেল গালায় ধপ্ করে বসিয়ে দেয়।

রমেন বলে, 'এই বন্দুক নিয়ে একজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিলাম মনে আছে তো? কেউ কোন ফন্দি-ফিকির-চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। সত্যি সত্যি গুলি করব কিন্তু।'

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে রমেন ওদের পাহারা দেয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দেড়শো ছেলে গুদাম থেকে চাল বার করে বিতরণ করে। কাছে ও দূরের অনেকগুলি গাঁ থেকে হাজার হাজার লোক আসে চালের জন্য। রমেন গাঁয়ে গাঁয়ে ঢ্যাঁঢরা পিটিয়ে দিয়েছিল।

পুলিশ দু'চারজন আসে কিন্তু ঢুকবার চেষ্টা করে না বরং ভিড় আর হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে কিছু কিছু সাহায্যই করে। ভোরে রমেন নিজে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছিল, তার বাবা আজ চাল বিতরণ করবেন! এই মর্ম্মে বড় বড় কয়েকটা ইস্তাহারও আড়তের বাহিরে টাঙিয়ে রেখেছিল।

সন্ধ্যার সময় চাল শেষ হল।

খবর পেয়ে পরদিনই হর্ষনাথ ফিরে এল। ছেলেকে সামনে রেখে গুম্ খেয়ে রইল। তার কান্না পাচ্ছিল!

আপদ

চাল নেই? বাঃ, বেশ!

সকালবেলা কি শুভ সংবাদ! স্বাধীনতা পাওয়ার বাসি পচা সংবাদটার মত। জর্জর প্রাণে আরেক দফা জ্বর এনে দেয়।

রাত্রে নলিনী খবরটা চেপে গিয়েছিল। আপিস ফেরত কেরানী বেচারাকে তখন ও-খবরটা জানিয়ে আর লাভ কি। কালো বাজারে ছাড়া চাল নেই। হলই বা সে সরকারি কেরানী, স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের বেতনভুক্ত। রাতারাতি চাল-বাড়ন্ত সমস্যার সমাধান করার সাধ্য তার নেই। নলিনীর মতে, সরকার স্বাধীন বলেই কেরানীদের দাসত্বের ডিগ্রি চড়েছে। তার যুক্তি আর ব্যাখ্যা একটু তির্যক ও রসালো হয়, কারণ সে কথাগুলি রসিকতা করেই বলে। এত চড়া তার ক্ষোভ যে বেশি তেতে লোহা জ্যোতির্ময় হওয়ার মত তার প্রাণের জ্বালা ব্যঙ্গ হয়ে বিচ্ছুরিত হয়!

আমি কি করব? নলিনী আলগোছে বাঁকা হাসি হেসে বলে, তোমরা স্বাধীন হয়েছ, আমরা তো হইনি। আমরা ঘরের কোণে হাঁড়িই ঠেলছি। হাঁড়ি চড়াবার ব্যবস্থা তোমরাই বাদ দিয়েছ, আমরা করব কি?

কেউ যেন তাকে কিছু করতে বলেছে! এই রকম ঢং হয়েছে নলিনীর কথার—শুধু আজকাল নয়, অনেকদিন থেকে। আগে অন্য কথায় ঠোকর দিত, আজকাল কথায় কথায় এই স্বাধীনতার কথা তুলে খোঁচায়। কথা আরম্ভ করে 'আমি' দিয়ে, পরক্ষণে তা দাঁড়ায় 'আমরা ও তোমরা'র ব্যাপারে!

সে যেন কনাদ রায়ের বৌ নয়, তার ছেলে মেয়ের মা নয়, তার সংসারের গিন্নী নয়, সে ভিন্ন একটা জাতের এবং কনাদ অন্য একটা জাতের প্রতিনিধি।

ঘরে চাল নেই এ কি নতুন কিছু ব্যাপার? প্রায়ই একরকম চাল থাকে না, প্রায় সকলের ঘরেই। নলিনী এমনভাবে খবরটা দেয় যেন তারই পরামর্শে গভর্নমেণ্ট ঘরে ঘরে চালের অনটন ঘটিয়েছে, লোভী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চাল, আটা কাপড়-চোপড় সিকেয় তোলার সরকারী ষড়যন্ত্রে সেও যেন একজন অংশীদার। সেই যেন এই বিশ্বাসঘাতকের জগতে সবার সেরা বিশ্বাসঘাতক।

ঘরের কোণে হাঁড়ি ঠেলে বলে? অন্যদের হাতের কাছে পায় না, একমাত্র পুরুষ তাকেই পায় বলে?

কিন্তু তাকে পুরুষ মনে করে কি নলিনী? কথা শুনে সন্দেহ জাগে!

আজকেই চাল ফুরুলো? বিষ্যুদ্‌বার পর্য্যন্ত যেত না?

পেট বাড়েনি দুটো?

বাড়িতে লোক বাড়ে নি, পেট বেড়েছে দুটো। পেট! কথার কি ছিরি নলিনীর। পাকিস্তান থেকে দু'জন আত্মীয় এসে ঘাড়ে চেপেছে বটে এবং তাদের পেট ভরাতে হওয়ায় রেশনের আইনী চাল-আটা মঙ্গলবারেই শেষ হয়েছে। রেশন কার্ড সংগ্রহের হাঙ্গামা চুকলে আশা করা যায় ভবিষ্যতের সপ্তাহে আবার বিষ্যুদ্‌বার পর্য্যন্ত সরকারী বরাদ্দ খাদ্য টানা চলবে। শুক্রবার সকালে নলিনী মনে করিয়ে দেবে ঘরে এক দানা চাল নেই, একগুঁড়ো আটা নেই—তার আগে নয়। সে চোরা-বাজারে যাবে চালের সন্ধানে। বার বার এই কথা ভেবে বুকে বল পাওযা যাবে যে মোটে তিনটি দিন, শুধু আজ কাল পরশু, শুক্র শনি আর রবিবারটা চোরা চালে কোন রকমে চালান—হিসেব করে, আরও কম খেয়ে, কোনরকমে।

সোমবারে আবার রেশন মিলবে!

নলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে ইঁট-সুরকি-সিমেণ্টের নূতন গাঁথনিটার দিকে। বাড়ির পাশে কি তাড়াতাড়ি যে গড়ে উঠছে সিনেমা হউসটা। ওষুধের নেশার মত সস্তা আনন্দের জন্যে দু'টি ঘণ্টার জন্য বিব্রত অতিষ্ঠ মানুষ পয়সা দিচ্ছে, সে লাভে ভাগ বসাতে একদিন দেরিও যেন সইবে না।

তাড়াতাড়ি গড়ে তোলো, রোশনাই জ্বালো, দুয়ার খুলে দাও—কিছু একঘেয়ে ন্যাকামি, কিছু রেডিও মার্কা মাছি ওড়া সুরের ভনভনানি, কিছু দেশপ্রেম আর বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার বাসরঘরের বিপ্লবে সমাপ্তি, এরই জন্য ভিখারির মত মেয়ে-পুরুষ এসে ভিড় করুক টিকিট ঘরের দরজায়।

নিজের চিন্তায় চমক লাগে কনাদের—এ তার স্বকীয় নয়, নলিনীই এমনি করে বলে। চোখে কি জল নলিনীর? না চকচক করছে মনের জ্বালায়?

কি ভাবছ জানি, নলিনী ভারি গলায় বলে, নিজের পেটে পুরিনি আমি সব। কাল রাত্রে উপোস গেছে আমার।

আচমকা মুখ ফিরিয়ে সে মুচকে হাসে, মেয়েরা উপোস দিলে আগে মাছের একটা আঁস দাঁতে কাটত। মাসের ন'দশ তারিখ হল মাছের গন্ধও আসে না বাড়িতে। কি করি বল? তোমরা স্বাধীন হয়েছ—

থলি দাও। জুটো দিও, বাজারটাও সেরে আসব।

থলি নিয়ে কনাদ পালিয়ে যায়।

কিছুদিন আগেও কনাদ বোঝাত, তর্ক ও রাগারাগি করত। শেষে বলত, তুমি কি বুঝবে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার ত্যাগ নেই, ধৈর্য্য নেই, তুমি স্বার্থপর!

সম্প্রতি সে আর উৎসাহ পায় না। যত সহজ ভেবেছিল অত সহজ

নয় ব্যপার, না স্বাধীনতার প্রশ্ন না তার প্রতি নলিনীর অদ্ভুত জ্বালার মানে বোঝা।

ছোট ভাই চেঁচিয়ে পড়ছে, এমনি চেঁচিয়ে সেও একদিন পড়ায় মন বসাত, আলস্য কাটাত। পূর্ব্ব-বঙ্গের পলাতকা আত্মীয়া দু'টি, মা ও মেয়ে, সেঁতসেঁতে উনানটুকুর কোণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—সবাইকে খেতে দিয়ে নলিনী যে কাল না খেয়ে ছিল সেই বিষয়ে কি? অথবা নিজেদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে? কাকীমা আর খুকীকে এখানে রেখে রমেশকাকা ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠে যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে সেজন্য কনাদের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। তবু কাকীমা আর খুকীকে তার মারতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এত সকালেই সিনেমা হাউসটার কাজ শুরু হয়ে গেছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলবে।

মিস্ত্রী আর কুলিরা কিরকম মজুরি পায়? ভালই পায় নিশ্চয়, দিন ভালই চলে নিশ্চয়, নইলে কথায় কথায় স্ট্রাইক করার এত তেজ কোথায় পেত! হলদে কার্ডে ওদের রেশন পর্যন্ত বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে দেশের এমন সঙ্কটের সময়ে। ভবিষ্যৎ গড়বার বা ভাঙবার এই সন্ধিক্ষণ, ওরা যদি শুধু আদায় করার ফিকির ছেড়ে এই দুর্দিনে—

এ যেন মুখস্থ করা চিন্তা, তোতাপাখির মত শুধু আবৃত্তি করা নিজের মনে, পরের কাছে। নিজের মনও আর সায় দিতে চায় না। ইট গেঁথে গেঁথে নূতন দালান উঠেছে, তার এতদিনের পুরাণো বিশ্বাসের ইমারত পড়ছে ভেঙ্গে ভেঙ্গে। ভালই যদি দিন চলে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর তেজ যদি বাড়ে, উদয়াস্ত খেটে কেন মরবে মানুষ?

নিজেই কি সে খাটত?

এসব কথা শুনে নলিনী বলে, বোকো না বেশি। এতটুকু আশা ভরসা থাকলে মানুষ যেন কষ্ট সইতে নারাজ হয়। ভবিষ্যতের দিকে

চেয়ে আধপেটা খেয়ে প্রাণপাত করে না মানুষ একটু সংস্থানের জন্য ? মানুষ ভূত কি না সুখে থাকতে নিজেকে কিলোবে। ত্যাগ ত্যাগ করে তোমরা সবাইকে সন্ন্যাসী বানাতে চাইছ !

তোমরা! তাকে 'তোমরা' ছাড়া সম্বোধন করতে নলিনী ভুলে গেছে। দেশকে ভালবাসে বলে নলিনী বড় শ্রদ্ধা করত তাকে, নিজেকে উজার করে উন্মুখ অতল ভালবাসায় তার জীবন ভরে রাখত। নলিনী ভুলে গেছে আজও সে দেশকে ভালবাসে।

কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে, কত অল্পদিনে !

যুদ্ধ, বোমার ভয়, দুর্ভিক্ষ হাসিমুখে হেলায় পিছনে ঠেলে দিয়েছে, কিসের সমস্যা কিসের কি, তুমি আছ আমি আছি ! একটি মেয়েকে জন্ম দিতে সব ভুলে গেছে নলিনী।

তবু তাকে এতভাবে বাঁচিয়ে চলে কেন নলিনী ? রাত্রে কেন তাকে জানায় না ঘরে চাল নেই, সে না খেয়ে পেটের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পাশে এসে শুয়েছে ? আদর করতে চেয়ে কাছে টানায় খানিকক্ষণ সে কাঠ হয়ে শুয়েছিল, হাত সরিয়ে দিয়েছিল। কত দুঃখ আর ক্ষোভের সঙ্গে নলিনীকে তখন তার মনে হয়েছিল স্বার্থপর, এখন নিজের সেই জ্বালার কথা ভেবে লজ্জায় কনাদের মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে সাধ যায়। সারাদিন খেটে মেয়েকে মাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নলিনী শুয়েছিল অন্যদিনের মতই, সে টেরও পায়নি যে তার একমুঠো ভাত জোটে নি। তারপর নিজেই নলিনী পাশ ফিরে তার গলা জড়িয়েছিল। এটাও তার নলিনীর স্বার্থপরতাই মনে হয়েছিল।

সকালে এখন আকাশে সূর্য্য উঠেছে, নোংরা রাস্তায় মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, বাজারে তার পাশে দাঁড়িয়ে নলিনীর মতই রোগা ফোলা চোখ মুখ, আলুথালু কুৎসিত শিথিল ভঙ্গিতে শাড়ি জড়ান বস্তির একটি সস্তা বেশ্যা আধপোয়া কুঁচো চিংড়ি কিনছে। ভগবান আছেন

বলে আর ভরসা নেই কনাদের, সত্য আর আদর্শও হয়তো নেই, তবু কনাদ নিজের কাছে স্বীকার করে যে এখনও নলিনীকে সে স্বার্থপর বলেই ভাবছে। নলিনী জানে তার জন্যই তার সব, বর্ত্তমানের খাওয়া-পরা ও ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-বিরাম। তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নলিনী তাকে রাত্রে চালের কথা না বলে তাকে ঘুমোতে দেয়, তাকে বেশি চটান উচিত নয় ভেবেই উপোসী অবশ দেহটাকে পাশ ফিরিয়ে শীর্ণ হাত দু'টিকে তার গলায় জড়িয়ে দেয়! সে বাঁচলে, সে খুশি থাকলে তবেই নলিনীর স্বার্থ বজায় থাকবে!

নিজের এ চিন্তায় সে কোন গলদ খুঁজে পায় না। কিন্তু নলিনী স্বার্থপর—এই সত্যটা নিজের অপরাধের মত তাকে পীড়ন করে। এ স্বার্থপরতায় দোষ কোথায় নলিনীর ?

এটাই তো নিয়ম সংসারের, বাস্তব জগতের! ঘরে ঘরে সব নলিনীদের বেলাতেও তো একই হিসাব। স্বামীর কাছে ভাত কাপড় আর আশ্রয় চাইবে, স্বামীকে স্নেহযত্ন খাতির করবে—এর মধ্যে অনিয়মটা কি ?

গলদ কি তারই মূল্য বোধে ?

নলিনী তাকে উপলক্ষ করে তার মন সকলকে আজকাল খোঁচায় বলে, চারিদিকের দুরবস্থার জন্য দায়ী করে বলে, সংসারের চলতি নিয়মে নলিনীর চলাটাও একটা খুঁত হয়ে উঠেছে তার কাছে ?

আ মরণ!

চাপা মেয়েলি গলা তীব্র ভৎর্সনায় ফোঁস করে উঠে কণাদকে চমকে দেয়। তার মুখ লাল হয়ে যায়।

ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে সে শুধু ভুলে যায় নি যে এটা বাজার, সেই সস্তা বস্তির বেশ্যাটির দিকে যে হাঁ করে বিহ্বলের মত চেয়ে আছে এটাও খেয়াল ছিল না!

স্বাধীনতা

চাকরিটা সইয়ে নিতেই মাস তিনেক কেটে যায়। কোন দিকে তাকাবার অবসর পায় না।

চাকরী করা মানেই তো শুধু চাকরী করা নয়।

রাশি রাশি ব্যবস্থার প্রয়োজন যেন তার চাকরিটার জন্যই ওৎ পেতে ছিল, চাকরী পাওয়া মাত্র একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। কতদিকে কত যে তাদের অভাব এতদিন নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হওয়ায় যেন ঠিক মত আঁচ করা যায় নি, চাকরী নিয়ে এবার কোনটা ছেড়ে কোনটা মেটাবে, কারটা আগে কারটা পরে মেটাবে, হিসাব করতে বসে যেন দিশেহারা হয়ে যেতে হয়!

অভাবের প্রচণ্ড খরায় যেন খাঁ খাঁ করছিল চারিদিক, বেতনের পশলা বর্ষণ শুষে যাওয়ার রকম দেখেই কেবল তার প্রচণ্ডতা আঁচ করা যায়।

অভাব যে মানুষের অভাব-বোধ ভোঁতা করে দেয় সেটা আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ কে জানে!

কান্তার মত হিসেবী মেয়ে পর্যন্ত বেশ খানিকটা ভড়কে গিয়ে ভাবে, ও বাবা! তিনশ' টাকার চাকরী পেয়ে সে তবে একেবারে স্বর্গ রচনা করার স্বপ্ন দেখেছে!

সেই সঙ্গে একথাও ভাবে, ইস্ কি অবস্থাতেই এতদিন তবে আমাদের কেটেছিল?

এটাও সে টের পায় যে তাকে খুব শক্ত হতে হবে। তার তিনশ'

টাকার চাকরী থেকে সবাই যেরকম আশা করেছে মাসে মাসে হাজার টাকা হলেও সে আশা মেটানো যাবে কি না সন্দেহ!

হরিপ্রসন্ন পর্য্যন্ত যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মাসের বেতন পেতেই হরেন কাকার কাছে তিনশো টাকা দেনার একশো টাকা শোধ করে দিয়ে এসেছে।

প্রায় দু'বছর পড়ে আছে দেনাটা, শোধ করতে হবে বৈকি। কিন্তু একটু তো সবুর করতে হয়, চারিদিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আস্তে আস্তে দেনাটা শোধ করার ব্যবস্থা করতে হয়?

আত্মীয়ের কাছে দেনার জের টানতে লজ্জা করে বলে একদিকে সব ঢেলে দিলে চলবে কেন? মার গয়নাগুলি যে এদিকে বাঁধা রয়েছে আর মাসে মাসে সুদ গুণতে হচ্ছে!

হরেন কাকা সুদ নেয় না, দুদিন সবুর করলেও তার কিছু আসবে যাবে না—গয়না বাঁধার টাকাটাই বরং আগে শোধ করা উচিত ছিল। সুদ গোণা থেকে রেহাই পাওয়া যেত, গয়না কটা ছাড়িয়ে আনা যেত।

নাঃ তাকেই শক্ত হতে হবে। সবাই ভাববে চাকরী পেয়ে মেজাজ গরম হয়েছে কান্তার। কিন্তু ভাবলে আর উপায় কি!

অনিলের কথা সে ভুলতে পারে নি।

অনিলকে নয় অনিলের কথাটাকে।

অমন কত অনিলকে সে চেনে। কয়েক জনকে বহুকাল ধরে বেশ ভালভাবেই চেনে। একটু খাপছাড়া ঘটনার মধ্যে অনিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেই সে ধপাস্ করে তার প্রেমে পড়ে যাবে, কিছুতেই তাকে ভুলতে পারবে না, তাকে ভেবে ভেবে বিনিদ্র রাতগুলি দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে উঠবে—বানানো রসিকতা হিসাবে ছাড়া এর কোন মানেই হয় না!

খাঁচায় বন্দী আবেগ আর ভাবালতা খাইয়ে পোষ মানানো মেয়েরা অবশ্য বোঝে না এ রসিকতা—খাপছাড়া কোন ঘটনা বা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া কোন একটী অনিলের কাছাকাছি এসে দু'মিনিট দু'টো কথা বলাই তাদের কাছে অসম্ভব অবাস্তব স্বপ্ন হয়ে থাকে। এদের কাছে সম্ভব আর বাস্তব করতে তাই নিরনব্বুইটী উপন্যাসে নায়ক নায়িকা কাছে আসে আর প্রেমে পড়ে খাপছাড়া ঘটনা বা অ্যাক্সিডেন্টের সাহায্যে!

সাধে কি কান্তা দু'একটী ছাড়া উপন্যাস পড়তে পারে না, তার হাই ওঠে। খাপছাড়া ঘটনা জগতে ঘটেছে, অ্যাক্সিডেন্ট সর্ব্বদাই। ক'লাখ জীবনে কি ভাবে কেন ঘটে আর পরিণাম কি দাঁড়ায়।

চাকরীটা ফসকে যাওয়ায় তার বাড়ীর মানুষের হাঁড়ি মুখ আর মায়ের কান্নাকাটি—অনিলের এই কথাগুলি সে ভুলতে পারে না, বার বার মনে পড়ে যায়।

অনিল ঝোঁকের মাথায় তার বাড়ী এসে হাজির হয়েছিল। তারও মাঝে মাঝে ঝোঁক চাপতো অনিলের বাড়ী গিয়ে দেখে আসতে যে বাড়ির মানুষেরা কি বলছে আর করছে, অনিলের অবস্থা সত্যই কি-রকম দাঁড়িয়েছে।

চাকরী অনিলের পাওয়া উচিত। ইতিমধ্যেই পাওয়া উচিত। চাকরী সে পেয়েছে কি না কে জানে।

সত্য কথা বলতে কি, অনিল চলে যাবার পর তার কোয়ালিফি-কেশনের বিবরণ মাধবের কাছে শুনে কান্তা বেশ খানিকটা মরমে মরে আছে। তার কোনই দোষ নেই, সংসারের সাধারণ নিয়মনীতি বাইরে বলা যায় এমন কোন সম্পর্কই মাধবের সঙ্গে তার গড়ে ওঠেনি, গরীবের ঘরের মেয়ে হয়েও অসীম কষ্ট সয়ে আর প্রাণপাত চেষ্টা করে একটা চাকরী বাগানো ছাড়া আর কোন অপরাধই সে কারো কাছে করেনি।

তবু যেন সর্ব্বদাই মনে হয় সে একটা অনিয়মের জীবন্ত নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে ব্যবহার করা হয়েছে একটা দুর্নীতির সমর্থন আর প্রশ্রয় হিসাবে। মাধবের শুধু স্নেহের দাবী—সে সুখী হোক। আজ পর্য্যন্ত তার বেশী কিছুই সে চায় নি তার কাছে।

কতবার কত সুযোগ গেছে, ঘরে এবং বাইরে। মাধব তার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যভাবে একটিবার তাকায় নি পর্য্যন্ত!

কান্তা জানে যে অনেকে অনেক রকম ভাবছে। অনিল হয় তো বেশী করেই ভাবছে।

কিন্তু এরকম ভাবনা ওদেরই কুৎসিৎ মানসিক হীনতা দীনতার পরিচয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মাধবের চাল চলন কথা ও ব্যবহার।

তাকে চাকরীটা করে দিতে মাধবকেও সংঘাত সইতে হয়েছে বৈকি। চাকরী করে দেবার ক্ষমতা কি মানুষ আকাশ থেকে পায়, অনায়াসে পায়!

কয়দিন ভারি খুশী মনে হচ্ছিল মাধবকে, রোজ এসে চা খেয়ে গল্প করে যেত।

হঠাৎ বন্ধ হল তার আসা।

কান্তা আপিস করে নিজেই খবর নিতে গেল অসুখ হয়েছে নাকি!

সত্যই যেন অসুখ হয়েছে মাধবের। অসুস্থ মানুষের মতই থম থম করছে তার মুখ।

মনে আঘাত লেগেছে মাধবের—কঠিন আঘাত লেগেছে।

মাধব সখেদে বলে, ছি ছি, কি বিশ্রী এই জগত, কী ছোটলোক মানুষগুলি! গরীব মধ্যবিত্তের মেয়ে তুমি কত কষ্টে মানুষ হতে লড়ছ দেখে মায়া হল, তোমায় একটা চাকরী করে দিলাম, তার মানে বাঁদররা বলছে কিনা—ছি ছি!

কান্তা কি বলবে ভেবে পায় না। দুঃখ ক্ষোভ মায়া অভিমানে হৃদয়টা তার আলোড়িত হয় বলেই সে চুপ করে থাকে।

মেয়ে বলেই তাকে এভাবে তুচ্ছ করা সম্ভব হয়েছে, মাধবের এভাবে আহত হওয়াটাও তারই অপমান। তার সঙ্গে জড়িয়েই নিন্দা রটেছে মাধবের অথচ তাকে বাদ দিয়ে সবটা আঘাত লেগেছে তার অভিভাবক মাধবের!

মাধব নিজেই আবার বলে, তুমি আর আমার কাছে বেশী ঘন ঘন এসো না কান্তা। ছ'মাস একবছর তোমার আমার দেখাসাক্ষাৎ কম হলেই লোকের ভুল ধারনাটা কেটে যাবে।

কান্তার মুখ লাল হয়ে যায়।

: হার মানলেন?

: হার মানি নি। লোকে ভুল বুঝল আমাকে। কেষ্টরাধার দেশ তো। একটা মেয়েকে চাকরী দিলেই বজ্জাত হতে হয়। এমন হবে বুঝতে পারি নি কান্তা।

তাকে চাকরী দিয়ে মাধব আজ আফশোষ করছে!

: আমি রিজাইন দেব?

মাধবের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়। ধমকেয় সুরে বলে, চাকরী করে দিয়েছি, চাকরী করে যাও। লোকে কি বলে না বলে সেটা সামলাব আমি। তুমি রিজাইন দিতে যাবে কেন?

মঙ্গলাকাঙ্খী অভিভাবক গুরুজনের ধমকের সুর! কান্তা একটা ঢোঁক গেলে।

অভিভাবকত্বের একটা নতুন রূপ ক্রমে ক্রমে প্রকট হচ্ছিল মাধবের কথায়, ব্যবহারে—চাকরীটা করে দেবার ঠিক পর থেকে!
ধমকের সুরটা আজ প্রথম শুনল।

এ পর্য্যন্ত কথার নতুন ভঙ্গি আর সুরটা হয়েছে খুব বাধ্য নিরীহ মেয়েকে গুরুজনের এটা ওটা করতে বলা—একেবারে নিশ্চিন্তভাবে বলা যে কথা সে নিশ্চয় শুনবে, অবাধ্য হবার সাহসই পাবে না। রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে সুরু করেছিল কান্তা। কতখানি তাকে বাধ্য হতে হবে মাধবের, কতদিক দিয়ে মাধব তার জীবনকে নিয়ন্ত্রন করতে চাইবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

কান্তার কাছে যতই তেজ দেখাক মাধব, তার মনের একটা স্থায়ী আতঙ্ক আবার নাড়া খেয়েছে এ ব্যাপারে। এ আতঙ্ক তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ক্রমে ক্রমে, মানুষ তাকে কি চোখে দেখে সে বিষয়ে নিজের ধারণা আর বিশ্বাসে এইরকম ঘা লাগার ফলে।

মেয়েদের উপকার করে প্রতিদান মানুষ আদায় করে নেয়, কিন্তু সেটা অনিয়ম। এই অনিয়মটাই কি তবে এত বড় সত্য হয়ে উঠেছে যে তার মত মানুষের সম্পর্কেও লোকে এরকম ভাবতে পারে ?

ক্ষমতা খাটিয়ে অনাত্মীয়া সুন্দরী একটি মেয়েকে চাকরী করে দিয়েছে—এটুকু জানাই যথেষ্ট। এইটুকুই একেবারে অকাট্য প্রমাণ। যে চাকরী দিয়েছে সে মানুষটা কেমন বিচার করারও প্রয়োজন নেই।

কি সাংঘাতিক কথা!

এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত সে কি প্রমাণ দিয়ে আসে নি সংযম আর চরিত্রবলের ? কান্তাকে চাকরী করে দেবার বিশেষ ক্ষমতা হয় তো তার আয়ত্তে এসেছে দেশটা স্বাধীন হবার পর, কিন্তু খেলা করার সাধ থাকলে মূল্য দিয়ে মেয়ে কেনার ক্ষমতা যৌবনেও তো তার কম ছিল না। কত বন্ধু কত নটি কতভাবে তার সংযম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেছে। ভদ্র ঘরের বিপন্না অসহায়া কত মেয়ে বৌ তার কাছে এসেছে সাহায্য চাইতে, আজও আসে—একটু খারাপ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করা চলে এমন কোন আচরণ কি কেউ তার দেখেছে কোনদিন ?

রামচন্দ্রের মতই লোকে তাকে একনিষ্ঠ একপত্নীক চরিত্রবান মানুষ বলে জানে।

নৈতিক কঠোরতার এই খ্যাতি পর্য্যন্ত তার মিথ্যা দুর্ণাম ঠেকাতে পারল না?

সোজা হিসাব এরকম ভুল হয়ে গেলে তো বিপদের কথা।

আদর্শবাদী সংযমী ন্যায়নিষ্ঠ কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কাছে চিরকাল এই ভয়টাই সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে থাকে—জগৎ সংসার বুঝি এক অনিয়মের খপ্পরে গিয়ে পড়ল, মানুষের কাছে বুঝি মূল্যহীন হতে চলল আদর্শ উচ্চচিন্তা ন্যায়-পরায়ণতা নিয়মনীতি ইত্যাদি।

নিজের সুবিধাবাদী ধারণা ও বিশ্বাস ছাড়া তো অবলম্বন নেই আত্মকেন্দ্রিক মহৎ মানুষেরও, তাই নিজের হিসাব ও বিচারে যা হওয়া উচিত দাঁড়ায় তার বদলে বাস্তবে অন্যরকম হলে এসব মানুষের আতঙ্ক জন্মে যায়।

আগে থেকে আরও অনেক ব্যাপারে জমা হয়েছে ভয়, এবার নাড়া খেয়েছে সবটাই। বেড়াতে বেড়াতে কান্তাদের বাড়ী চা খেতে যাওয়ার সাহস তার হয় নি ক'দিনের মধ্যে।

.কিন্তু কান্তার কাছে তো প্রকাশ করা চলে না ভয়, তাই একেবারে ধমক হয়ে বেরিয়ে আসে তার তেজ দেখানোটা।

তার কর্তালিপণা কোথায় চড়বে ভেবে কান্তা অস্বস্তি বোধ করছে টের পেলে এই আতঙ্কই আবার নাড়া খেত মাধবের।

ভাল চেয়ে সুপরামর্শ দেওয়াকে কান্তা ভাববে চাকরী করে দেওয়ার প্রতিদানে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ—একি ভয়ানক অনুচিত কথা!

সে কি দীর্ঘকাল ধরে পরিচয় দেয়নি তার মহৎ উদার হৃদয়ের? অন্যের কথা দূরে থাক, আর্দালি পিয়ন চাকর বাকরকে পর্য্যন্ত সে অন্যায় ভাবে শাসন করে না। পছন্দ না হলেও নিজের মেয়ের কত চালচলন

কত মতামত সে নীরবে বরদাস্ত করে যায়। সে কিনা হুকুম চালাবে কান্তার ওপর!

মাধবকে কেউ বলে দেবার নেই, বলে দিলেও সে মানবে কিনা সন্দেহ যে নিজের মেয়ে তার অনেক ইচ্ছা অনেক মত মানে না বলে, মেয়েকে হুকুম মানাবার তার ক্ষমতা নেই বলে সত্য সত্যই সে সুযোগ পেয়ে নিজের অনেক মত আর ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে শুরু করেছে কান্তার ঘাড়ে।

আগে যে সব কথা নিয়ে কান্তা নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ত, এখন ওসব কথা উঠলে সে যে আর তর্ক করে না এবং মাধব তাতে খুসী হয়—এটাই তো তার অকাট্য প্রমাণ!

প্রতিদান সে নিতে শুরু করেছে বৈকি—অন্যভাবে না নিয়ে নিচ্ছে আনুগত্যের প্রতিদান।

কান্তা ধীরে ধীরে বলে, আপনি ক'দিন যাননি। আমিও কি আসা যাওয়া বন্ধ করব?

মাধব বলে, নিশ্চয় না। মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে মেলামেশা বন্ধ করব কেন? মাঝে মধ্যে আমি যাব, তুমিও তেমনি আসবে যাবে। মেলা-মেশাটা শুধু কমিয়ে দেব আমরা, আর কিছু নয়। লোকে তো আর বুঝবে না মেয়ের মতই তোমায় আমি স্নেহ করি।

একটু থেমে বলে, ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। আমি বুঝতে পারছি, দিন দিন নোংরা হয়ে যাচ্ছে মানুষের মন।

আগের চেয়ে ঢের বেশী ছোটলোক হয়ে গেছে মানুষ, মায়ের এই কথাটা মানতে পারে না কান্তা। কিন্তু সে প্রতিবাদও করে না।

•

বাড়ীর অন্য মানুষগুলির ভাবও আজ যেন কেমন কেমন।

সেটা আশ্চর্য্য কিছুই নয়। তাকে নিয়ে মাধবের নামে কুৎসা রটেছে সেটা তো আর সহজ ব্যাপার নয় এদের কাছে।

কি করছ মৃদুলা ?

কিছু না কান্তাদি।

বাড়ীতে এলেই যে হাসিমুখে সানন্দ অভ্যর্থনা জানায়, আজ সে গোমড়া মুখে চেয়ে থাকে কান্তার নতুন জুতোর দিকে।

পরশু নতুন বাড়ীতে উঠে যাচ্ছি, একবার যেও।

যাব।

মৃদুলার মা গৌরী এঘর থেকে ওঘরে যাবার সময় একবার চোখ তুলে তাকায়, তবু যেন দেখতে পায় নি এইভাবে তার সঙ্গে একটিও কথা না বলেই চলে যায়।

মাধবের বড় জামাই শচীন তাকে দেখে যেন মুচকি হাসিটা চাপা দেবার জন্যই মুখে হাতের তালু ঘষে দাড়িতে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে নির্ব্বিকার উদাসীন ভাবে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকার ভাণ করে।

নীচে নামবার সময় সিঁড়ির মাঝামাঝি মুখোমুখি হয়ে যায় কান্তা আর অমলা। অগত্যা দু'জনকেই দাঁড়াতে হয়।

কান্তা জিজ্ঞাসা করে, শরীর কেমন আছে ?

ওই একরকম। ওষুধ গিলছি।

ভার মুখের ভাবেও স্পষ্ট ঘোষণা যে ক্ষমা নেই তোমার। অমলাকে শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে আগে কোনবার রক্ষা থাকেনি। একটানা ফিরিস্তি শুনতে হয়েছে শরীরে তার কি কি গ্লানি, কোন কোন ডাক্তার চিকিৎসা করছে, ওষুধ আর পথ্যের কি ব্যবস্থা হয়েছে ইত্যাদি সব কিছুর।

এই মুখরতাই একটা লক্ষণ তার রোগের। কান্তার উপর গভীর বিতৃষ্ণা রোগের লক্ষণটাকে পর্য্যন্ত যেন আজ চাপা দিয়ে দিয়েছে।

কে যে কার পাশ কাটিয়ে নীচে নামে উপরে ওঠে ঠিক বোঝাই যায় না।

কিন্তু নীচের তলায় নেমে গেলে কান্তার সঙ্গে যেচে খানিক্ষণ কথা বলে মাধবের বিধবা বোন শান্তিময়ী। ধীরে শান্তভাবে কথা বলে। সব সময়েই অত্যন্ত নিরুদ্বেগ মনে হয় তাকে।

বয়স মাধবের চেয়ে দু'তিন বছর মোটে কম হবে। মাজা রং, ঋজু নিটোল হাল্কা দেহ। একরাশি কালো চুলের মধ্যে এখানে ওখানে কয়েকটা সাদা চুল উঁকি দিচ্ছে। পরণে ধপধপে সাদা ধুতি আর জামা।

তাকে দেখে আর তার কথা শুনে মনে হয় শান্তিময়ী নামটি তার সার্থক। গোমড়া মুখে নয়, নিশ্চিন্ত ভাবে সে জিজ্ঞাসা করে, খবরের কাগজেও নাকি কেচ্ছা বেরিয়েছে ?

প্রশ্ন শুনে কান্তা ভড়কে গিয়ে বলে, না না, খবরের কাগজে কিছু বেরিয়েছে বলে তো শুনি নি।

তবু ভাল। কে যেন বললে খবরের কাগজেও নাকি কায়দা করে আইন বাঁচিয়ে নাম পর্য্যন্ত ছাপিয়ে দিয়েছে। শুনে থেকে কেবল তোমার কথা ভাবছিলাম—কি দশা হত তোমার তা হলে ?

এই জ্বালাতেই জ্বলছিল মনটা। মাধব শুধু বলেছে নিজের কথা—তার মত মানুষের নামেও এমন বিশ্রী মিথ্যা বদনাম রটে, এও জগতে সম্ভব হল ! নোংরা কুৎসিত হয়ে গেছে মানুষের মন—নইলে মাধবকেও মানুষ খারাপ ভাবতে পারে।

মাধবের নামে কুৎসা রটেছে বলে আহত বিক্ষুব্ধ হয়েছে বাড়ীর অন্যান্য সকলের মন। সে এই কুৎসার কারণ বলে সকলে কুরিয়ে কুরিয়ে চেয়েছে তার দিকে, তার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে অস্বীকার করেছে।

দুর্নাম যেন একা মাধবের।

এ মিথ্যা দুর্নামে যেন তার কোন ক্ষতি নেই, তার কোন আপ্‌শোষের কারণ নেই।

জাতে সে মেয়ে, যতই পাশ করুক আর মোটা মাইনের চাকরী বাগাক, সমাজে স্ত্রীজাতীয়া জীব হিসাবে তার পরিচয় মোটেই ফুরিয়ে যায় নি। ফুরিয়ে যাবার কথাও নয়।

সে তো সত্যি স্ত্রীলোক।

পুরুষের চেয়ে দুর্নাম যে তার পক্ষে কত বেশী ভয়ানক ব্যাপার, এ বাড়ীর কেউ যেন সেটা খেয়াল করাও দরকার মনে করে নি।

তাকে চাকরী দিয়ে মাধব বিপাকে পড়েছে—এজন্য তার দিকটা গণ্যই নয়।

সে যেন পতিতার সামিল হয়ে গেছে এদের কাছে, তার সামাজিক সুনাম দুর্নাম মানমর্যাদার কোন প্রশ্নই যেন ওঠে না।

একমাত্র শান্তিময়ী তার দিকে টেনে কথা বলেছে। সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েই কান্তার হৃদয়ের জ্বালা আগুনের মত জ্বলে ওঠে।

আমারি সব দোষ তো? আমি জানি—আমি জানি! আপনার দাদাকে আমি রিজাইন দেবার কথা বলেছি খবর রাখেন?

শান্তিময়ী শুধু বলে, ছি! বিপদে পড়লে তোমাদেরও যদি মাথা বিগড়ে যায়, হিষ্টিরিয়া হয়, সাধারণ মেয়েরা কার দিকে চাইবে?

কি কথায় কি কথা এল। মানুষের মনের নোংরামির অভিযানে সেও অংশ নিয়েছে এই নালিশের বদলে বলা যে নোংরামির কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য মেয়েরা তার মত মেয়ের মুখ চেয়ে আছে, তার দায়িত্ব অনেক! কান্তা তাই চুপ করে থাকে।

তার তো হিষ্টিরিয়া রোগ নেই যে নিজের কথা, ন্যায়সঙ্গত নালিশের

কথা হলেও নিজের কথা বলার জন্য জগৎ সংসার তুচ্ছ করে দেবে, যেহেতু মাধব আর তার বাড়ীর অন্য লোকেরা তার দিকটা খেয়াল করে নি!

নরম হলে চলবে না।

কি করতে বলছেন?

কান্তা ধীর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে।

শান্তিময়ী তার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। টেনে নিয়ে যায় না, কারণ কান্তা তার মনোভাব টের পেয়ে হাত ধরামাত্র তার সঙ্গে চলতে সুরু করে।

ঘরে একটি লোহার চৌকিতে ধপধপে বিছানা। আর কোন আসবাব নেই। বিধবা বলেই মাধব বোনকে ঘর দিয়েছে ছোট, ঘরে একজনের শোবার মত কাঠ বা লোহার চৌকি পাতলে আর কোন আসবাব আনা সম্ভব হয় না।

কয়েকটা টুল আছে। আর আছে একটি বুকসেলফ্। টুলকটাকে চৌকির নীচে ঠেলে দিয়ে শান্তিময়ী মেঝের মুক্ত অংশটুকুতে ছোট একটি চীনা মাদুর বিছায়।

বলে, এসো-আমরা আয়েস করে বসি।

পা ছড়িয়ে বসে বলে।

দাদা বুঝি তোমায় খুব ভড়কে দিয়েছে?

ওনার বদনাম হল—

শান্তিময়ী খিল খিলিয়ে হাসে। হাত বাড়িয়ে কোন থেকে পানের বাটা টেনে নিয়ে পান সেজে একটু দোক্তা দিয়ে মুখে পোরে।

পিক্ ফেলে এসে বলে, তুমি বড় বোকা মেয়ে। দাদা কি তোমার জন্যে তোমায় চাকরী দিয়েছে? দাদার মধ্যে কত রকম ভাবের লড়াই টের পাও না? নিজের ভাবে নিজের দায়েই চাকরী দিয়েছে তোমায়।

কিন্তু সে তো গেল ভিন্ন কথা। তোমার নিজের কথা ভাবছ না তুমি? নিজের ভালমন্দের হিসেব দাদার এদিকে ঠিক আছে, তোমার হিসেবটা তুমি করছ না?

নিজেকে এই প্রশ্ন করার জন্যই প্রাণটা যেন ছটফট করছিল, কিন্তু প্রশ্নটা স্পষ্ট করে তুলতে পারে নি। কিসে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল স্বাধীন চিন্তা। মুগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কান্তা শান্তিময়ীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শান্তিময়ী আবার বলে, দাদার আবার বদনাম কিসের? হোমরা চোমরা ব্যাটছেলে, এসব বদনামে তার কি এসে যায়? লোকে বরং তারিফ করবে। কিন্তু তুমি বাছা মেয়েছেলে, সুনাম বদনামে তোমার জীবনে ওলোট পালোট হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা মাথায় নিজের দিকটা ভাল করে ভাবো—

মাথাই গুলিয়ে যাচ্ছে ভাবব কি।

মেয়ে মানুষের মাথা গুলিয়ে গেলে চলে? একটা সোজা কথা তো বুঝতে পারছ? বদনামের ফলে হয়তো ওই মাধববাবুটি ছাড়া সারা জীবনে তোমার আর গতি থাকবে না। ঘরে ঘরে বৌগুলির যে দশা তোমারও প্রায় তেমনি দাঁড়াবে।

হতাশা নয়, একটা ক্ষোভ নিয়ে কান্তা বাড়ী ফেরে। অনেক ব্যাপারে অনেকবার বুকটা তার জ্বালা করেছে, কিন্তু এ ক্ষোভ অন্য ধরনের, এ ক্ষোভ আর মিটবে না।

সে জাতীয়া জীব, এত কষ্টে এত চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে স্বাধীনভাবে রোজগার করবার অধিকার এ সমাজে তার জন্মগত নয়—এই ক্ষোভ ঘুচবার নয়—পুরানো অভ্যস্ত নালিশটাই আবার নতুন করে তীব্রভাবে নাড়া খেলেও ধীরে ধীরে আবার থিতিয়েও যেতে পারত। শান্তিময়ী

ধরদের সঙ্গে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে যে সুনাম দুর্নামের ব্যাপারে সে যে নিরুপায় অসহায়া নারী এটা যেন সে ভুলে না যায়। মনের মোড়টাই ঘুরে গিয়েছে কান্তার।

না, আসল কথা মোটেই তা নয়। বদনামে মাধবের কিছু আসে যায় না, মুস্কিল শুধু তার, এটা একেবারে ভিন্ন ব্যাপার।

আসল গলদটা হল এই যে মাধব কেন তাকে চাকরী দেয়, চাকরী দেবার ক্ষমতা পায়। এ একটা কুৎসিৎ অনিয়ম। অনিলকে অথবা তাকে মাধব বেছে নিয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়, মাধবের সঙ্গে তার খারাপ সম্পর্ক আছে কি নেই সেটাও আলাদা ব্যাপার, খেয়াল খুসীতে মাধব যে চাকরীর জন্য যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারে এটাই হল নিয়মনীতির আসল ব্যাভিচার।

এ ব্যাপারে সে যখন অংশ নিয়েছে, সে ও ব্যাভিচারিণী বৈকি! নইলে সত্যই কি কায়িক ব্যাভিচারের দুর্নামে তার খুব বেশী আসে যায়, এতখানি বিচলিত হবার প্রয়োজন ঘটে? সে কি গেঁয়ো মেয়ে না সহরেও যে বিরাট সংখ্যক মানুষকে গেঁয়ো জীবন আঁকড়ে থাকে সেও রয়ে গেছে তাদের স্তরে—এতটুকু বিচ্যুতিতে পাড়ায় যাদের নিয়ে কানাকানি চলে আর মেয়ে বলেই সে কাণাকাণিকে তারও ভয় করতে হবে!

শান্তিময়ী আটকে রয়ে গেছে তার যৌবনের দিনগুলিতে। তার ধারনাই নেই কিভাবে বদলে গিয়েছে রোজগেরে মেয়েদের জীবন-সংগ্রামের পরিবেশ পর্য্যন্ত!

ক্ষোভ নিয়ে বাড়ী ফিরেই কান্তা টের পায়, সকলের মধ্যে গভীর অসন্তোষ। মাসকাবার হয়েছে সে মাইনে পেয়েছে কিন্তু বাড়ীর প্রায় প্রত্যেকের কতক দাবীদাওয়া যে এখনো সে মেটায় নি।

নিরুদ্দেশ

মঞ্জু বাপের বাড়ী যায় না প্রায় তিন বছর। অপমানে অভিমানে যায় না। বছর তিনেক আগে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মাসখানেক বাপের বাড়ী থাকতে গিয়েছিল। তার বাবা যোগেশ তাদের জন্য কিছু খরচ চেয়েছিল জামাই বিনয়ের কাছে। বড়ই আহত আর অপমানিত বোধ করেছিল মঞ্জু।

দিনকাল বড়ই খারাপ কিন্তু অবস্থা তো নেহাত খারাপ নয় তার বাপের। যোগেশ নিজে মোটা বেতনে চাকরী করে, মঞ্জুর বড় ভাই অনিলও ভাল চাকরী পেয়েছে। আগের মত না হলেও মোটামুটি সুখে স্বচ্ছন্দেই তাদের দিন কাটে। মেয়ে বছরে একটা কি দেড়টা মাস থাকতে এলে তার কাছে খরচ চাওয়া!

মুখে কিছুই বলে নি মঞ্জু। ঝগড়াঝাঁটি করে নি। করলে বোধ হয় তার অপমান অভিমানের জেরটা তিনবছর গড়াত না।

বিনয়কে সে বলেছিল তুমি কাল পরশুই ফিরে যাও। গিয়ে একশ'টা টাকা বাবাকে পাঠিয়ে দিয়ো। দিন দশেক পরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। লিখবে তোমার অসুবিধা হচ্ছে।

—মোটে দিন দশেক থাকবে? তাহলে টাকা পাঠাব কেন?

—ছি! এত ছোট করো'না মন। বাবাকে নয় একশটা টাকা এমনিই দিলে, অত হিসেব কেন? আর তো দিতে হবে না কোনদিন। এ জীবনে আমি আর বাপের বাড়ী আসব না।

*   *   *

মা-বোন, বাপ-দাদা অনেকবার যেতে লিখেছে, যোগেশ আর অনিল নিতেও এসেছে কয়েকবার— নানা অজুহাতে মঞ্জু যায় নি।

ছোটবোনের বিয়েতে পর্য্যন্ত যায় নি।

বিনয়ের হাতে একজোড়া কানের দুল পাঠিয়ে দিয়েছে। বিনয়কে পরিস্কার বলে দিয়েছে, এক রাত্রির বেশী সে যেন তার বাপের বাড়ীতে বাস না করে, শালীর বিয়ের ফুর্তিতে যেন মেতে না যায়!

অনিল অবশ্য এক রাত্রিও থাকে নি। চাকরীর অজুহাত জানিয়ে সন্ধ্যার পরেই বিদায় নিয়েছে শ্বশুরবাড়ী থেকে।

* * * *

মাঝে মাঝে আজকাল মনটা কেমন করে ওঠে মঞ্জুর। কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়ী ঘুরে আসবার সাধটা উত্তাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, একটা ফাঁকা ছেলেমানুষি অভিমানের বশে বোকার মত সে মাঝে মাঝে কিছুদিনের মা-বাপ ভাই-বোনের সাহচর্যের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে চলেছে—অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য একটা মনগড়া কারণে। সে ঝগড়া করে নি। খোলাখুলিভাবে এতটুকু তিক্ততা সৃষ্টি করে নি—তিক্ততা যেটুকু সৃষ্টি হয়েছে সেটা বরং বার বার নেবার চেষ্টা করলেও সে নানা ছুতায় বাপের বাড়ী যায় নি বলেই।

ও বাড়ীর মানুষেরা হয় তো খানিকটা আঁচ করেছে তার মনের কথা, সেবার একমাস দেড়মাস থাকতে গিয়ে বিনয়ের কাছে খরচ চাওয়ার পর মোটে দিন দশেক ম্লানগম্ভীর মুখে কাটিয়ে ফিরে যাওয়ার পর তিন বছর একদিনের জন্য বাপের বাড়ী পা না দেবার কারণ কতকটা নিশ্চয় আন্দাজ করেছে।

কিন্তু ওটাই যে তার আসল কারণ, তার মন যে বিগড়ে গেছে ওই একটি কারণে, সেটা থেকে গেছে তারই মনের গহনে— ওরা কল্পনাও করতে পারে নি।

বিয়ের পর ছ'সাত বছর যখন-খুশি বাপের বাড়ী গেছে, যতদিন খুশি থেকেছে, খরচ দেবার কথা কেউ বলে নি। এই আগুন-লাগা

চড়া বাজারে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে একমাসের বেশী আরাম করতে গিয়ে থাকলে তার বাবা যদি ভাসা ভাসা ভাবে তাদের জন্য কিছু খরচ চেয়েই থাকে তার স্বামীর কাছে, তাতে তো তার কোনই অপমান ছিল না!

সে আজ অনায়াসে কয়েকদিন বাপের বাড়ী ঘুরে আসতে পারে। সকলে খুশি হবে। কিন্তু কি করে যায় মঞ্জু?

সে রকম আগ্রহের সঙ্গে বাপ-ভাই তো তাকে যেতে বলে না।

ওদেরও তো মান অপমান অভিমান আছে, ধৈর্যের সীমা আছে। বছরের পর বছর ওরা কি তাকে তোষামোদ করে চলবে, দয়া করে বাপের বাড়ী আয়, কদিন থেকে যা? অথচ ওরা বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে জোরের সঙ্গে নিতে না চাইলে এখন নিজের মান বজায় রেখে যাওয়াও সম্ভব নয় মঞ্জুর পক্ষে। নিজের অপমান অভিমানের কি ফাঁদেই আটক পড়ে গেছে মঞ্জু!

বিনয় বলে, কি হল তোমার? দিন দিন এরকম মনমরা হয়ে মুষড়ে যাচ্ছ? কাহিল হচ্ছ?

মঞ্জু জোর করে হেসে বলে, দেখেছ নজর করে? ভালবাসা আছে মনে হচ্ছে যেন!

এত সহজে কথাটা এড়িয়ে যাবার সুযোগ বিনয় তাকে দেয় না। বলে, কাহিল নয় খনিকটা হলে, সেটা বুঝতে পারি। মাছ দুধ পাচ্ছ না, রেশনের চাল সইছে না। কিন্তু এত মন মরা হয়ে যাচ্ছ কেন? মেজাজ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? অভাব বাড়ুক, সেজন্য রোগা হও আপত্তি নেই! কিন্তু গাছতলা সার করতে হলেও মনমেজাজ বিগড়ে যাবার মানুষ তো তুমি নও।

মঞ্জু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, ধীরে ধীরে ঠোঁট কামড়ায়। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

বিনয় বলে, অ! ব্যাপার গুরুতর, সেটা ধরেছি ঠিক। ব্যাপার কি তাও যেন বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে!

মঞ্জু সেলাই করা রঙিন শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মাথা নাড়ে, এটা বুঝতে পারবে না কিছুতেই।

বিনয় একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, যদি পেরে থাকি? বলব তোমার কি হয়েছে? বাপের বাড়ী যাবার জন্য মন কেমন করছে, খারাপ লাগছে।

মঞ্জু একেবারে থ' বনে যায়।

—তুমি কি ম্যাজিক জানো?

—আজ্ঞে না। এটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। ঝন্‌ঝাট ঝামেলা এসবেরও তো রীতিনীতি আছে—বেশী দিন চললে ওসব পুরানো হয়ে যায়। দুঃখ-কষ্ট তোমার গা সওয়া হয়ে গেছে—নতুন বড়রকম কোন মুসকিলে পড় নি। বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে একটা ছেলেমানুষী কাণ্ড করেছিলে, সেটার জের টানতে পারছ না। তা ছাড়া তোমার মুষড়ে পড়ার আর কোন কারণ থাকতে পারে না।

মঞ্জু খানিক চুপ করে থেকে বলে, আমার তো খারাপ লাগছে অনেকদিন থেকেই, অ্যাদ্দিন কিছু বল নি যে?

বিনয় বলে, আমি কি বেশীদিন টের পেয়েছি? কত ঝন্‌ঝাটে থাকি বুঝতে পার তো!

—বুঝতে পারি না? কি চেহারা হয়েছে তোমাব চোখে দেখতে পাই না আমি?

বিনয় একটু হাসে।—দেখতে পাও বলেই তো পনের দিনের ছুটি নিয়েছি। তোমাদের নিয়ে পনের দিন শ্বশুরবাড়ীর জামাই আদর ভোগ করে মোটা হয়ে ফিরে আসব।

অন্য অবস্থায় মঞ্জু নিশ্চয় রাগ করত।

তাকে কিছু না জানিয়ে বিনয় তাদের নিয়ে পনের দিন তার বাপের বাড়ী থেকে আসবার সব ঠিক করে ফেলেছে! সে কি এতই তুচ্ছ যে তার সঙ্গে একটু পরামর্শ করাও দরকার মনে করল না!

কিন্তু বিনয়ের ওই একটি কথা তাকে দমিয়ে দেয়। পনর দিন বিনয় তার বাপের বাড়ীতে জামাই আদর ভোগ করবে, বিশ্রাম করবে!

শরীর সারানোর কথাটা তামাসা। পনের দিন জামাই আদর কেন লাটসাহেবি-আদর ভোগ করলেও শরীরটা তার আগের মত জোরালো হবে না, সেজন্য কয়েক মাসের তোড়জোড় চাই।

তবে বিশ্রাম পাবে। ছুটিটা এখানে কাটালে তার শুধু আপিসের কাজ থেকে বিশ্রাম, অন্য সমস্ত ঝন্‌ঝাট বজায় থাকবে। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পনরটা দিন হাতপা গুটিয়ে শুয়ে বসে কাটাতে পারবে।

মঞ্জু তাই শুধু বলে, এভাবে যেচে যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিনয় বলে, কতবার এসে এসে সাধাসাধি করে গেছে ভুলো না। যেচে গেলেই বরং এখন উদারতা দেখানো হবে, তুমি নিজে থেকে ওদের দোষ ক্ষমা করেছ।

সত্যই খুসি হয় মঞ্জুর বাপের বাড়ীর মানুষেরা। আদর-যত্নের একেবারে সমারোহ লাগিয়ে দেয়, তিন বছরের পাওনা যেন পুষিয়ে দিতে চায়।

মঞ্জু ভাবে, কি বোকার মত রাগ করেছিলাম এদের ওপর!

হাসি আনন্দ গল্পগুজবের মধ্যে দীর্ঘকালের ভুলবোঝা-বুঝি যেন শূন্যে মিলিয়ে যায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে। এক-দিনে মঞ্জু যেন সজীব হয়ে ওঠে।

বিনয় নিঃশ্বাস ফেলে গভীর। স্বস্তির নিঃশ্বাস। তাকেও যেন বেশ চাঙ্গা মনে হয়।

মঞ্জু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলে, তুমি সত্যি আমার যে কি উপকারটা করলে! তোমার জন্যই আসা হল, নইলে বাকী জীবনটা হয়তো মিথ্যা রাগ নিয়ে মিছিমিছি জ্বলে পুড়ে কাটত।

বিনয় পরম খুশির সঙ্গে বলে, আমিও বেঁচেছি তোমাদের মিটমাট হয়ে গেল।

মঞ্জু কি জানত তার হাসি আনন্দের জেরটা ঠিক দুটিদিনের বেশী চলবে না!

ঠিক দুদিন তার পরম শান্তিতে কাটে। তৃতীয় দিন সকালে চা খাবার খেয়ে ফর্সা জামাকাপড় পরে দু'খানা আধময়লা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবী কাগজে পুটলি করে বিনয়কে বেরোতে দেখে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করে, কোথা যাচ্ছ?

—জামা-কাপড়টা লণ্ড্রীতে দিয়ে আসি।

—তোমার যাবার কি দরকার?

—যাই, একটু হাঁটাও হবে।

সেই যে হেঁটে বেড়িয়ে আসার উদ্দেশ্যে বিনয় বার হয়, আর সে ফিরে আসে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে শুরু হয় বাড়ীর লোকের অস্বস্তি-বোধ, ক্রমে ক্রমে সেটা দাঁড়িয়ে যায় দুর্ভাবনায়।

দিন কাটে রাত আসে ভোর হয়, বিনয় ফেরে না। এভাবে কিছুক্ষণের জন্য একটা মানুষ বেরিয়ে গিয়ে বাড়ী না ফিরলে খোঁজখবর নেবার জন্য যা কিছু করা দরকার সবই করা হয়।

যোগেশ বলে, অ্যাক্সিডেন্ট হয় নি, তাহলে জানা যেত।

এইটুকুই সকলের ভরসা। দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে তার খবরটা অজানা থাকে না।

মঞ্জু একটা ঢোঁক গেলে। বলে, আমি ফিরে যাই বাবা। আমার এখানে আসা নিয়েই একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। ও বাড়ীতে ফিরে গেছে মনে হয়।

অনিল বলে, দাঁড়া, আমি খবর নিয়ে আসছি।

—চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ওরা থাক্।

অনিলের সঙ্গে মঞ্জু একা ও বাড়ীতে যায়। দেখা যায় তাদের ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে দুটো।

অন্য ঘরের ভাড়াটেদের কাছে খবর পাওয়া যায়, বিনয় আগের দিন সকালে ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য এসেছিল। বাড়ীওলার সঙ্গে বিনয়ের ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হয়, বিনয় দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর বাড়ীওয়ালা আরেকটা তালা এঁটে দিয়েছে।

বাড়ী ভাড়া নিয়ে ঝগড়া?

মঞ্জু যেন আকাশ থেকে পড়ে!

বাড়ীওলা রসিকের বাড়ী কাছেই, মঞ্জুও চেনে। অনিলকে নিয়ে সে ব্যাপার বুঝতে চায়।

অনিল জিজ্ঞাসা করে, আপনি এদের দরজায় তালা লাগিয়েছেন কেন?

রসিক বলে, ভাড়া না মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে যাতে পালাতে না পারেন এইজন্যে!

—ক'মাসের ভাড়া বাকি?

—তিনমাস হয়ে গেছে।

মঞ্জু আর অনিল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। অনিল রসিককে বলে, তালা খুলে দিন। আজকেই সব ভাড়া পাবেন।

ঘরে ঢুকে ধপাস করে খাটে বসে পড়ে মঞ্জু বলে, এ কিরকম ব্যাপার হল? তিনমাস ভাড়া বাকি পড়েছে আমি কিছু জানি না!

অনিল বলে, তুই বোস, আমি ব্যাঙ্ক থেকে ঘুরে আসি।

মঞ্জু একটু ভেবে বলে, এক কাজ করো, ব্যাঙ্ক হয়ে ওর আপিসটা ঘুরে এসো। আপিসে খবর নেওয়া উচিত।

রাস্তায় অনিল ট্যাক্সি নেয়। ব্যাঙ্কে টাকা তুলে বিনয়ের আপিসে খবর নিয়ে বাড়ী ফিরতে তার দু'ঘন্টার বেশী সময় লাগে না। খবর কি? না, পাঁচ মাস আগে আপিস থেকে বিনয় ছাঁটাই হয়েছিল।

মঞ্জু বিহ্বলের মত বলে, পাঁচ মাস আগে! রোজ নিয়মমত আপিস করেছে। পনের দিনের ছুটি নিয়েছে বলল।

—তা হলে কি অন্য আপিসে ঢুকেছে?

মঞ্জু ম্লান গম্ভীর মুখে বলে, আমায় না জানিয়ে? ছাঁটাই হবার কথাটা নয় চেপে গিয়েছিল, আরেকটা কাজ পেলে জানাত না? আমি এবার বুঝেছি ব্যাপার। আর উপায় ছিল না, আমার দায় তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে সরে গেছে।

অনিল একটু ভেবে বলে, লজ্জায় সরে গেছে সেটা বুঝতে পারি —কিন্তু এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে কেন? একটা চিঠি লিখে তোকে তো জানিয়ে যেতে পারত!

মঞ্জু বলে, তাও বুঝলে না? পাঁচ মাস টেনেছে, আমায় টের পেতে দেয় নি। আশা করছিল এ কদিনের মধ্যে যদি কিছু করতে পারে, সামলে নিতে পারে।

অনিল বলে, আহা, নিরুদ্দেশ হল বলেই আমরা জানতে পারলাম। ওখানে থেকে উপায়ের চেষ্টা করলে আমরা তো টেরও পেতাম না।

মঞ্জু বিষণ্ণ মুখে একটু হাসে।—সেরকম মানুষ কিনা, এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ীর অন্ন ধ্বংস করবে। তাহলে আগেই গিয়ে সাহায্যের জন্য হাত পাতত।

পাষণ্ড

বাজার থেকে ফিরে জামাটা খুলে বিপিন খালি গায়ে বাইরের রোয়াকে গিয়ে বসে। বর্ষার গুমোট গরমে হেঁটে বাজার করে আনতে জামাটা ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছিল।

বাইরে বসে গায়ের ঘামটা শুকিয়ে নেবে।

হাত পাখাটা ছিল মেয়ের হাতে। ভিতরে বসলে মেয়ে হাওয়া করতে এগিয়ে আসবে। মেয়ের অযাচিত সেবায় বিপিন আজকাল বড়ই অস্বস্তি বোধ করে।

হতভাগী মেয়ে। আগের জন্মে বোধ হয় অনেক পাপ করেছিল, এ জন্মে তাই এক পাষণ্ডের হাতে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল জীবনটা।

মাস শেষ হয়ে এসেছে। বাজার থেকে নামমাত্র মাছটুকু আনাও আজ ক'দিন বন্ধ রয়েছে। মাছ এত ভালবাসে রাধা, মাছ ছাড়া মুখে তার ভাত রোচে না। কোথায় রোজগেরে স্বামীর ঘরে হু'বেলা মাছ ভাত খাবে, সর্ব্বস্ব খুইয়ে গরীব বাপের ঘাড়ে এসে চেপে শাক পাতা ডাঁটা চিবিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

রাধা আজ প্রায় এক বছরের বেশী বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু মেয়েটার দুর্ভাগ্য আর পাষণ্ড জামাইটার চিন্তা আজও অভ্যস্ত হয় নি বিপিনের। প্রাণের জ্বালা আরও বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

মানুষ এমনভাবে বখে যেতে পারে, এত নীচে নামতে পারে অধঃপতনের পথ ধরে? চাকুরে ছেলে ভাল ছেলে বলে কত আশা করে

যথা সর্বস্ব খরচ করে মেয়েটাকে ওর হাতে তুলে দিয়েছিল। বিয়ের পরেও তিন চার বছর টের পাওয়া যায় নি টাকা পয়সা স্বভাব চরিত্র কি রেটে সে উৎসন্ন দিতে বসেছে, বিসর্জ্জন দিচ্ছে মনুষ্যত্ব। টের পাবার পর মোটে দু'বছর লেগেছে চরম অবস্থায় পৌছতে।

স্বাস্থ্য গেছে, চাকরী গেছে, একে একে রাধার গয়না গেছে,—সব চেয়ে দামী যে আত্মীয় বন্ধু দশজনের বিশ্বাস, তাও গেছে।

সবাই হাল ছেড়েছে, তারা ছাড়তে পারে নি। সকলকে ঠকানো থেকে চুরি চামারি পর্য্যন্ত শুরু করেছে জেনেও আশা ছাড়া যায় নি।

হয় তো এ ঝোঁক কেটে যাবে। হয় তো চৈতন্য হবে।

কিন্তু কপালটাই মন্দ যে-মেয়ের, তার স্বামীর বেলা কি আর সে অঘটন ঘটে? যে মানুষ ছিল সে অমানুষ হলেও আবার মানুষ হয়?

রাধার সব যাওয়ার পর তাকে আর ছেলেমেয়ে দুটিকে সমীর আবর্জনার মত ফেলে গেছে এখানে। তবু তাদের রেহাই দেয় নি।

সে ধূর্ত। সে টের পেয়েছে তাদের এই নিরুপায় আশা—হয় তো সে শুধ্‌রে যাবে। এখন তো সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এ পথে কত সুখ। বাড়ীতে গেলে আত্মীয় বন্ধু কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বদ উপায়ে কোন রকমে দুটো পয়সা হাতে এলে বদ খেয়ালে দু'দিনে তা উড়ে যায়, আবার সম্বল করতে হয় রাস্তা। এবার হয় তো সে নিজেকে সংশোধন করবে।

যতদিন এই আশাটুকু বজায় রাখা গেছে, মাঝে মাঝে এসে নানা ছুতায় দশ পনেরোটা করে টাকা বাগিয়ে নিয়ে গেছে সমীর।

তার এই অমানুষিক নির্লজ্জতাই অবশেষে একেবারে শেষ করে দিয়েছে তাদের শেষ আশাটুকু।

পরের বার সমীর এলে বাইরে দরজা থেকেই তাকে বিদায় করে দিতে হয়েছে।

রাধা নিজেই বলেছে : না বাবা, আর প্রশ্রয় দিও না। এখন থেকে মনে কর আমি বিধবা হয়েছি।

*   *   *

আবার আজ সমীরকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে ঘামে ভেজা শরীরটা বিপিনের ঠাণ্ডা অবসন্ন হয়ে আসে।

আরও কদর্য্য কুৎসিত হয়ে গেছে সমীরের চেহারা। কোটরে বসা চোখে একটা ঝিমানো ভাব, মুখে ঘর্মাক্ত ক্লেদের মত শ্রান্তি মাখানো।

বিপিন প্রায় কাতর অনুনয়ের সুরে বলে, আবার কি চাও বাবা? মাসের শেষে আমার হাতে একটি পয়সাও নেই—

আগে কোন বার করে নি, আজ সমীর তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

বলে, আজ্ঞে টাকা চাই না। আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করব। ক'টা দরকারী কথা আছে।

বিপিন ভাবে, কে জানে এ আবার কি নতুন চাল? আবার কি চালাকি খাটাতে এসেছে জামাই?

মুখে বলে, একটু দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে আসি।

জিজ্ঞাসা তাকে করতে হয় না। রাধা সমীরকে জানালা দিয়ে আসতে দেখেছিল, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার কথাও সব শুনেছে। কবে কখন আবার তার স্বামী তার বাবাকে ঠকাতে আসবে বলে সে কি সারাদিন জানালায় চোখ কান পেতে রাখে?

রাধা বলে, বাবা, বলে দাও, দেখা করে কাজ নেই, আমি দেখা করব না।

কি বলতে চায় একবার শুনলে হত না?

না। কোন লাভ নেই। নতুন কি মতলব করেছে, বানিয়ে বানিয়ে কত রকম কি বলবে, মাথাটা ঘুরে যাবে আবার। আগেরবার

বলেছিল, আমার লুকানো কিছু নেই ? এবার সেটা বাগাতে এসেছে। মিথ্যে অশান্তি করে লাভ নেই, বাবা।

চলে যেতে বলব ?

তাই বল। নিজেকে বিধবা ভেবেছি, তাই আমার ভাল।

বিপিন অপরাধীর মত বলে, রাধা তো তোমার সাথে দেখা করবে না, বাবা।

দেখা করবে না ?

মাথা নত করে সমীর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বিপিন টের পায় এ পাশের ওপাশের আর সামনের বাড়ীর জানালা দিয়ে অনেকগুলি কৌতূহলী মুখ উঁকি দিচ্ছে।

তার জামাই-এর বিষয় জানতে কারো বাকী নেই। মেয়ে তার এখানে তার বাড়ীতেই আছে, তবু মেয়ের জামাই এসে কিভাবে দরজা থেকে ফিরে যায় দেখবার জন্য তাদের ঔৎসুক্যের সীমা নাই।

এ দৃশ্য যেন সিনেমার সস্তা গল্পের চেয়ে রসালো।

বিপিনও মাথা হেঁট করে।

মুখ তুলে সমীর বলে, আমি শুধু পাঁচ মিনিট কথা বলেই চলে যাব।

বিপিনকে জবাব দিতে হয় না।

জানালা দিয়ে অদৃশ্য রাধার স্পষ্ট জবাব আসে, আমি বিধবা হয়েছি। ভূতের সঙ্গে আমি এক মিনিটও কথা বলতে চাই না।

সমীর চোখ তুলে জানালার দিকে চায়। কিন্তু রাধাকে দেখতে পায় না।

মাথায় ঝাঁকি দিতে গিয়ে সে যেন নিজের শীর্ণ দেহটাকেও ঝাঁকানি দেয়। ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের কোঁচা তুলে মুখে চাপা দিয়ে কয়েকবার কাসে। তারপর আবার বিপিনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নীরবে ধীরে ধীরে চলে যায়।

তখনও বিপিনের গায়ের ঘাম শুকোয় নি। মনের

* * *

দিন দশেক পরে বিকালের ডাকে একখানা পোষ্টকার্ড আসে সমীরের। পেন্সিলের অস্পষ্ট লেখা কিন্তু পড়া যায়।

সে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পড়ে আছে। তার সমস্ত অপরাধ যেন সকলে ক্ষমা করে। সম্ভব হলে ছেলেমেয়ে দু'টিকে শেষবারের মত দেখতে চায়।

এই পরিণতিই ঘটে সমীরদের। সে জাত-বজ্জাত নয়; বেপরোয়া ঔদাসীন্যের সঙ্গে যারা পাপের পথে হাঁটতে সুরু করে মোটর হাঁকায়, তাদের ধাতুতে সে গড়া নয়। পাপ তার পেশা নয়, নেশা। স্বাভাবিক সুস্থ জীবন আয়ত্তে থাকলেও অসুস্থ জীবনের অস্বাভাবিক তীব্রতা উন্মাদনা বিষাক্ত ভয়ানক নেশার মতই তার মত মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

রাধার মা কেঁদে ফেলে।

রাধার হাত-পা থর থর করে কাঁপছিল। কিন্তু মুখে সে বলে: আঃ, থামো না। এ আরেকটা মিথ্যে চালও তো হতে পারে? ও মানুষটার কোন কথায় বিশ্বাস আছে?

মার কান্না থেমে যায়। সেটা অসম্ভব নয়, ছল চাতুরী মিথ্যা আর প্রতারণার মতলব ভাঁজতে সে যে কত বড় ওস্তাদ তার পরিচয় সমীর ভালভাবেই দিয়েছে বটে।

তবু মেয়ের দিকে চেয়ে মা অবাক হয়ে থাকে। তার সেই মেয়ে রাধা, কারো একটু আঙ্গুল কেটেছে দেখলে যার কান্না আসত, এই চিঠি পেয়েও আজ সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত।

বিপিন আফিস থেকে ফিরে আসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। চিঠি দেখে তার শুকনো মুখে বিহ্বলতা নেমে আসে।

একবার তো যেতে হয় তা হলে?

তুমি অস্থির হ'য়ো না বাবা। কতবার তোমায় ঠকিয়েছে—মনে নেই?

তাই বলে তো মরতে দেওয়া যায় না ?

তাই কি যায় ? আমরা যাবো চল, কিন্তু তোমায় শক্ত থাকতে হবে। আগে বুঝবে সত্যি লিখেছে কিনা, তারপর যাহোক ব্যবস্থা করবে। ব্যাকুল হয়ে ওর কোন ফাঁদে আমরা আর পা দেব না।

বিপিনও অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সত্যই পাষণ্ড সমীর, নইলে এমনভাবে কেউ মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে যে রাস্তার ধারে মৃত্যু শয্যায় পড়ে থাকার সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেও নিজের স্ত্রীর সন্দেহ থেকে যায়—এ তার প্রতারণার আরেকটা কৌশল হওয়া অসম্ভব নয় !

কিন্তু যাই ভাবুক আর যাই বলুক, ভিতরটা যে রাধার কাঁপছে সেটা টের পাওয়া যায়। ঢোঁক গিলতে গিয়ে দু'একবারের চেষ্টায় গিলতে পারে না। ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলে, আতঙ্কের চাপে তার শ্বাসযন্ত্র খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে এসেছে।

অসহায় নিরুপায় উদ্বাস্তু-মানুষে ভরা শিয়ালদহ ষ্টেশন। শিশু থেকে বুড়ো, মেয়েপুরুষ, ছোটবড় পরিবার, একলা মানুষ। এদের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে সমীরকে।

চারিদিকে তাকায় আর রাধা ভাবে সমীরকে নয় নিজের দোষে এখানে এসে শেষ শয্যা পাততে হয়েছে, এরা কার কাছে কি দোষ করেছিল ? কি পাপে এদের এই পরিণাম, এই শাস্তি ?

এক প্রান্তে সমীরকে পাওয়া যায়। একটা কাপড়ের পুঁটলী মাথায় দিয়ে সে সতরঞ্চিতে শুয়ে ছিল। তাকে দেখেই তার অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হয়ে যায়।

বিপিন নাম ধরে ডাকতে সে অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে বিহ্বলের মত চেয়ে থাকে। গায়ে হাত দিয়ে দেখা যায়, জ্বর নেই।

আমাদের চিনতে পারছ না?

একটু মাথা নেড়ে সমীর সায় দেয়।

অগত্যা বাড়ীতেই তাকে আনতে হয়। জামা কাপড় ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে হয়, তারই ছেলেমেয়ের দুধটুকু গরম করে খাইয়ে দিতে হয়, ডেকে আনতে হয় ডাক্তার।

ডাক্তার পরীক্ষা করে জানায়, আর কিছু হয় নি, একটু দুর্ব্বল।

একটু? রাধা ঠোঁট কামড়ায়।

* * *

রাত বাড়ে। চারিদিক নিঝুম হয়ে আসে।

সমীরকে খাটে শুইয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে রাধা মেঝেতে নিজের শোয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনেক দিনের খাট। যখন সে নিজের মেয়েটার মত ছোট ছিল, মার সঙ্গে এই খাটে শুয়ে ঘুমোত।

রাধার ঘুম আসে না। আকাশ পাতাল ভাবে। কতকাল পরে স্বামীকে ঘরে পেয়েছে, খাটে শুয়ে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ করছে। কিন্তু রাধার মনে আশা নেই, আনন্দ নেই, স্বস্তি নেই। অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা আর অতীতের স্মৃতি যন্ত্রণার মতই চাপ দিচ্ছে মাথার মধ্যে।

ষ্টেশনে পড়ে থাকলে হয় তো মরে যেত। এবারের মত সমীর মরবে না। কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? এমনিভাবে কে কতবার ঠেকিয়ে রাখবে তার অপমৃত্যু? আপনজনের আশ্রয়ে আপনজনের সেবাযত্নে মৃত্যু ঠেকিয়ে সুস্থ হয়ে উঠে সে তো আপন হবে না। অশান্তিতে আবার সে অসহ্য করে তুলবে জীবন। আবার তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে বাড়ী থেকে।

কিছুদিন পরের এই আগামী ঘটনার কথা কল্পনা করে রাধা শিউরে ওঠে।

কেন তাদের খবর দিতে যায় সমীর, শেষ দেখা দেখতে চায়

ছেলেমেয়েকে ? কেন সে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উদ্বাস্তুদের মধ্যে নীরবে মরে গিয়ে তাদের রেহাই দেয় না ?

ঘরের আলোটা জ্বলে ওঠায় রাধা চমকে ওঠে। খাট থেকে নেমে সমীর নিজে আলো জ্বেলেছে !

ধড়মড় করে উঠে বসে রাধা। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলা যাকে ধরাধরি করে গাড়ী থেকে নামিয়ে খাটে শোয়াতে হয়েছিল, নিজে নিজে সে উঠে দাঁড়িয়েছে সাধারণ সুস্থ মানুষের মত।

নিজে নিজে সে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছে !

নতুন এক আতঙ্কে বুক কেঁপে যায় রাধার। কে জানে কি মতলব নিয়ে এই কৌশলে সমীর বাড়ীতে ঢুকেছে, রাত দুপুরে এখন মতলব হাসিল করবে।

জল খেয়ে সমীর একটু তফাতে বিছানায় বসে। ছেলেমেয়ের গায়ে একবার হাত বুলায়।

বলে : ভেবেছিলাম দু'তিনদিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হব। কিন্তু আর ছলনা ভাল লাগছে না। তোমার সঙ্গে কথা না কয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতে পারলাম না।

আবার তুমি আমাদের ঠকালে ?

ঠকিয়েছি, কিন্তু এবার আমার মতলব ভাল।

রাধা চুপ করে থাকে।

বিশ্বাস হয় না ? না হওয়াই উচিত। কিন্তু কাল তোমার বিশ্বাস হবে। সকালে আমি নিজেই চলে যাব। টাকাও চাইব না, কিছু চুরিও করব না।

এরকম করার মানে কি ?

মানে ? মানেও তুমি বিশ্বাস করবে না আজ। আমি জীবনের

মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছি। তোমাদের কাছ থেকে একটু মনের বল জোগাড় করতে এসেছি। মনটা বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে রাধা।

কে জানে এ আবার কোন নাটকের ভূমিকা? রাধা চুপ করে থাকে।

সমীর বলে, অনেকবার পাঁক থেকে উঠবার চেষ্টা করেছি, পারি নি। কিসে কাবু হতাম জানো? হতাশায়। নিজেকে যে শুধরে নেব সে তো অল্পে হবে না, দুদিনে হবে না। যা ভেঙ্গেছি আবার তা গড়তে হলে অনেক দিন ধরে অনেক কষ্ট করতে হবে। এটা ভাবলেই মাথা ঘুরে যেত। ভাবতাম আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়। উদ্বাস্তুরা আমার হতাশা ভেঙ্গে দিয়েছে।

উদ্বাস্তুরা?

সমীর সায় দেয়।

অনেকদিন থেকে পথে পথে ঘুরছি তো। সারাদিন পয়সা উপায়ের ফন্দি-ফিকির নিয়ে ঘুরি, রাত্রে ষ্টেশনে ওদের মধ্যে শুয়ে থাকি। দেখলাম কি জান? যথাসর্ব্বস্ব গেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করবে জানা নেই, কিন্তু কি মনের জোর! হাল ছেড়ে ভেসে যাবে না কিছুতেই, একদিন আবার সব ঠিক হবে। যতদিন কষ্ট করতে হয় করবে। কেউ সাহায্য করে ভাল, না করলে নিজেরাই চেষ্টা করবে উঠতে। ওদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমারও মনের মোড় ঘুরে গেছে রাধা। ওরা পারলে, আমি কেন পারব না? ওরা হাল ছাড়েনি, আমি কেন ছাড়ব?

মিথ্যাকে সত্যের মত বলার অভিনয়ে সমীর অনেকবার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। বারবার ঠকেও আবার বিশ্বাস করতে হয়েছে সে কথা। কিন্তু আজ যেন তার কথায় একটা সহজ সরলতার নতুন সুর শোনা যায়।

বহুকাল পরে আবার স্বামীর সঙ্গে মাঝ রাত্রে এক ঘরে বসে কথা

বলতে বলতে নতুন আশার ক্ষীণ গুঞ্জনের সুর ওঠে রাধার মনে। কিন্তু—

এ সব কথা চিঠিতে লিখলেই পারতে খোলাখুলি? এ রকম ছলনা করা উচিত হয় নি।

তোমরা কি বিশ্বাস করতে?

প্রথম প্রথম নাই বা করতাম? সত্যি তুমি যদি আবার ভাল হও আমরা কি অবিশ্বাস করব? তোমার সুমতি হোক এটাই তো আমরা মানত করছি দিনরাত।

রাধা চোখ নামায়, আপশোষের সঙ্গে বলে, তোমার মন বাঁকা রয়ে গেছে, তুমি ভাল হবে কি করে?

দমে যাবার বদলে সমীর উৎসাহিত হয়ে বলে, কি আশ্চর্য্য, তুমিও এটা ভেবেছ? খাটে শুয়ে শুয়ে ঠিক এই কথাটা ভাবছিলাম। তোমাদের একটু দেখব, মনের জোর পাব, সেজন্য তোমাদেরি যে ধাপ্পা দিচ্ছি এটা খেয়ালও হয় নি আগে। কেমন একটা উত্তেজিত অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম, এখানে আসার পর ধীরে ধীরে সেটা কেটে গেল। তখন বুঝতে পারলাম, এটা করা আমার উচিত হয় নি। তাই তো উঠে পড়লাম, তোমার সঙ্গে ছলনার জের টানব না।

ছেলের গায়ে হাত রেখে সে আবার বলে, আমি যা চেয়েছিলাম পেয়ে গেছি রাধা।

*　　*　　*

পরদিন সকালে সমীরকে চা আর খাবার দিয়ে রাধা বলে, তুমি তবে এখানেই থাকো, কাজের চেষ্টা কর।

সমীর বলে, না। তোমাদের আদরে মন নরম হয়ে যাবে। আমি ভাবছি, কোন উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়ে হোগলার কুঁড়ে তুলে থাকব। মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব।